দুটি উপন্যাস

ফেরোমন ও সাগর গৌরব

ফেরোমন

অজেয় রায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

ফেরোমন

পূর্ব আফ্রিকার ডার-এস-সালাম শহর থেকে সমুদ্রপথে লঞ্চে চেপে আমরা রুফিজি নদীর মোহনার দি.ক চলেছি। আমরা মানে প্রাণিতত্ত্ববিদ্ নবগোপাল ঘোষ অর্থাৎ আমাদের মামাবাবু, আমার বন্ধু সুনন্দ, আমি শ্রীমান অসিত ও বিল্ হার্ডি। আমরা তিনজন ভারতীয় বেশ কিছুদিন ধরে ডার-এস-সালামের ন্যাচারেল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের কিউরেটর ডঃ হাইনের আতিথেয়তা ভোগ করছি। ইতিমধ্যে আমাদের একটা অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেছে! রুফিজি নদীর মোহনার কাছে একটা দ্বীপে মামাবাবু সরীসৃপ ও পাখির মাঝামাঝি কোন জীবের এক দুর্লভ প্রস্তরীভূত কংকাল আবিষ্কার করেন এবং ঘটনাচক্রে সেই ফসিলটা আবার সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যায়। দ্বীপের অধিবাসীরা টাঙ্গানিকার এক গ্রাম থেকে ফসিলটা দ্বীপে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের এই দ্বিতীয় অভিযানের উদ্দেশ্য হল, যে গ্রামে ফসিলটা পাওয়া গিয়েছিল, তারই আশেপাশে ওই রকম আরও অন্য ফসিলের অনুসন্ধান করা। মামাবাবুর বিশ্বাস ছিল, বিল হার্ডি ওই গ্রামে যাবার একটা সহজ রাস্তা বাতলে দিতে পারবেন, কারণ সে ওই গ্রামে গিয়েছিল। সেই রকমই অনুরোধ করে একটা চিঠি পাওয়ামাত্র বিল ডার-এস-সালামে চলে আসেন এবং তার পরদিনই আমরা রওনা হয়ে যাই। এখানে বলা দরকার—হার্ডি নামক এই শ্বেতাঙ্গ শিকারী পর্যটকটি সারা পূর্ব আফ্রিকায় ডেয়ারিং বিল নামে খ্যাত। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়টাই তিনি আফ্রিকা মহাদেশ চষে বেড়িয়েছেন। দীর্ঘ ঋজু বলিষ্ঠ চেহারা, বয়স পঞ্চাশের উপর, কিন্তু কানের পাশে সামান্য কয়েকটা পাকা

চুল ছাড়া কোথাও প্রৌঢ়ত্বের ছাপ নেই।

মামাবাবু এতক্ষণ ডেকে বসে ভারী মনোযোগ দিয়ে 'জুওলজি' পত্রিকা পড়ছিলেন, এখন সেটা বন্ধ করে প্রায় আপন মনেই বলে উঠলেন, 'আশ্চর্য আবিষ্কার···ফেরোমন!'

বিল্ হার্ডি কিছুদূরে ঠোঁটে পাইপ কামড়ে চোখ বুজে লঞ্চের রেলিং-এর উপর পা তুলে বসে আছেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। মামাবাবুর সঙ্গে নানান জায়গায় নানান অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে আমাদের দু'জনের মধ্যেই সেটা বেশ বেশি পরিমাণেই সঞ্চারিত হয়েছে, তাই জিজ্ঞেস না করে পারলাম না—

'ফেরোমন কি জিনিস, মামাবাবু?'

মামাবাবু তাঁর চশমার কাঁচটা রুমালে মুছতে মুছতে বললেন, 'ফেরোমন হচ্ছে প্রাণীদেহ-নিঃসৃত একরকম রাসায়নিক বস্তু। অনেক প্রাণী এর সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে নানারকম যোগাযোগ করে।'

আমি আর সুনন্দ পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করলাম।

'পরিষ্কার হলো না?' মামাবাবু মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন। বেশ, আরো সহজ করে বলছি। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর দেহ-কোষ থেকে এক বা একাধিক রকম লালা বা রস বেরোয়। যে জিনিসটা বেরোয়, সেটা হলো কয়েকটা রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণ। এগুলোর প্রত্যেকটির গন্ধ বা স্বাদ একটা বিশেষ সংকেত বহন করে। সেই সংকেতের ভাষা কেবল ওই প্রজাতির প্রাণীরাই বুঝতে পারে। যে রাসায়নিক বস্তুর সাহায্যে এই সাংকেতিক যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে, তাকেই বলে ফেরোমন। কোনো কোনো উন্নত প্রাণী, যাদের মুখের ভাষা আছে, তাদের মধ্যেও বিশেষ প্রয়োজনে ফোরোমনের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, হরিণের মৃগনাভি বা কস্তুরী এক রকম ফেরোমন। পুরুষ কস্তুরীমৃগ এর তীব্র সুবাস বাতাসে ছড়িয়ে তার হরিণীকে ডাকে। তবে কীট-পতঙ্গ

ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর জীবের ব্যাপারে বলা চলে যে তাদের সামাজিক জীবনটা একেবারে পুরোপুরি ফেরোমন নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন পিঁপড়ে, পিঁপড়ে নিয়েই গবেষণা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। পিঁপড়েরা চোখে দেখে না সেটা জ্ঞান বোধ হয়। বিভিন্ন প্রজাতির পিঁপড়ের মধ্যে অন্তত দশ রকম ফেরোমন আবিষ্কার করা গেছে। কোনোটার গন্ধে তারা বিষাদের সংকেত দেয়, কোনোটার সাহায্যে তারা মৃত সঙ্গীকে আবিষ্কার করে। কোনোটা তাদের সার বেঁধে পথ চলতে সাহায্য করে, আবার কোনো ফেরোমনের সাহায্যে তারা সাথীকে কাছে ডাকে।'

ফেরোমনের বৃত্তান্ত শুনে সত্যিই আমাদের অবাক লাগছিল। মামাবাবু কয়েক সেকেণ্ড দম নিয়ে আবার বলে চললেন, 'অনেক জাতের পোকা ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে। কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করেও তাদের ধ্বংস করা যায় না। মনে করো, কোনো পোকা ধান নষ্ট করে। আবিষ্কার করা গেল যে ওই জাতের স্ত্রী পোকা ফেরোমনের সাহায্যে পুরুষ পোকাকে কাছে ডাকে। তারপর ল্যাবরেটরীতে ওই ফেরোমনের রাসায়নিক মিশ্রণ আবিষ্কার হলো। তৈরি হল কৃত্রিম ফেরোমন। ব্যস, এইবার কৃত্রিম ফেরোমন ধান-ক্ষেতের একপাশে ছড়িয়ে রেখে দাও। তখন কী হবে? পুরুষ পোকারা ছুটে আসবে কৃত্রিম ফেরোমনের গন্ধ পেয়ে আর সেই সুযোগে তাদের ধ্বংস করে ফেলা যাবে। আমেরিকায় এই উপায়ে প্রতি বছর হাজার হাজার 'জিপসি মথ' ধ্বংস করে শস্য বাঁচানো হয়।'

ফেরোমনের বর্ণনা হয়তো আরো কিছুক্ষণ চলত, কিন্তু বাধ্য হয়ে থামাতে হলো। সামনেই শহর দেখা যাচ্ছে। নদীর মোহনায় ছোট্ট শহর, নাম মোহোরা। এই মোহোরা থেকেই আমাদের হাঁটা-পথে এগোতে হবে ফসিলের সন্ধানে। আমরা উঠে পড়লাম।

সাফারির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ডার-এস-সালাম থেকে নিয়ে

এসেছিলাম। বিল একটা রাইফেল ও পিস্তল এনেছিলেন। তাছাড়া ডঃ হাইনের বন্দুকটা আমরা চেয়ে এনেছিলাম। বিল বলেছিলেন, 'শিকার আমি ছেড়ে দিয়েছি। অযথা প্রাণীহত্যা করতে আর ভাল লাগে না। তবে আমাদের মাংসের দরকার হবে, টাটকা মাংস। তাই মাঝে মাঝে টোটা খরচ করব।'

মোহোরা থেকে বিল চারজন চাম্বা পোর্টার ভাড়া করলেন। এরা মালপত্র বইবে। দরকার মত মাটি পাথর খুঁড়বে। একজন কিছুটা রান্নাও জানে। শহর ছেড়ে পরদিন আমরা উন্মুক্ত প্রকৃতির রাজ্যে পদব্রজে যাত্রা করলাম।

বেশি তাড়াতাড়ি এগোতে পারছিলাম না। একে খারাপ পথ, তার উপর মামাবাবুর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। পথে যেতে যেতে তিনি মাঝে মাঝে আমাদের অপেক্ষা করতে বলছিলেন। নতুন ধরনের পোকা-মাকড়, সরীসৃপ ইত্যাদি দেখে তিনি দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন। চোখে দূরবীণ লাগিয়ে গভীর মনোযোগে লক্ষ্য করছিলেন। কখনও স্পেসিমেনটি জীবিত বা মৃত অবস্থায় সংগ্রহ না করে ছাড়ছিলেন না। নিজেই দেরি করছিলেন, আবার তারপরই আমাদের 'চল চল, এগোও', বলে তাড়া লাগাচ্ছিলেন।

বিল পথ চলতে চলতে আমাদের নানারকম গাছপালা চেনাচ্ছিলেন। আফ্রিকার বনভূমিতে পথ চলার কায়দা-কানুন রপ্ত করাচ্ছিলেন। ছোট-বড় জীবজন্তু দেখিয়ে বোঝাচ্ছিলেন তাদের বয়স, মেজাজ ইত্যাদি।

প্রায় পনেরো মাইল পথ চললাম। একবার মাত্র দুপুরে খেতে থেমেছিলাম। তারপর টানা হণ্টন। সন্ধ্যে নাগাদ তাঁবু ফেললাম। সবাই বেশ ক্লান্ত, রান্নার যোগাড় হতে থাকল। বিল বললেন, 'কাল আমরা নদীর কাছ ছেড়ে বাঁ দিকে বেঁকে যাব। প্রথমে একটা বড় 'স্টেপ' অর্থাৎ তৃণভূমি পড়বে। সেটা পেরিয়ে ছোট ছোট পাহাড়ের সারি। ঐখানেই সেই গ্রাম ছিল। এতদূর অবধি আসতে অসুবিধা হয়নি, তবে স্টেপের মধ্যে দিয়ে দিক

নির্ণয় করা একটু কঠিন। যা হোক, মনে হয় ঠিকঠাক পৌঁছে যাব। কতগুলো চিহ্ন আমার মনে আছে।'

মামাবাবু একটা প্যাকিং বাক্সকে টেবিল বানিয়ে কিছু পোকা-মাকড়ের স্পেসিমেন পরীক্ষা করতে লাগলেন। আমি ও সুনন্দ বিলের কাছে বসে রইলাম গল্প শোনার আশায়।

বিল একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে আরাম করে পা ছড়িয়ে একমনে কিছুক্ষণ পাইপ টানতে টানতে দূরে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'আফ্রিকার প্রকৃতিতে মায়া আছে বুঝলে, আজ রাতে চাঁদ উঠবে। তখন দেখবে কি অদ্ভুত রহস্যময় দেশ। এই বিশাল মহাদেশের কতটুকুই বা আজ পর্যন্ত আমরা জেনেছি—এখানকার অসংখ্য জীবজন্তু, গাছপালা, এ দেশের উপজাতিদের রীতিনীতি।'

প্রশ্ন করলাম, 'আপনি প্রথম কবে আফ্রিকায় আসেন?'

'আজ থেকে তিরিশ বছর আগে, মাত্র বাইশ বছর বয়সে।'

'কি করতে এসেছিলেন? শিকার?'

'দূর দূর। তখন আমি ভাল করে বন্দুক চালাতেই জানতাম না। এলাম স্রেফ খেয়ালে পড়ে।'

'যাঃ। স্কটল্যাণ্ড থেকে এতদূরে অকারণে?' সুনন্দ প্রতিবাদ জানাল।

'সত্যি বলছি, কিছু ভেবে আসিনি। এসেছিলাম নিছক অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। আফ্রিকা সম্বন্ধে আমার তখন ধারণা ছিল অতি সামান্য, শুধু জানতাম এ এক বিশাল অজানা রহস্যময় দেশ। ঠিক করলাম, যেমন এ দেশের আদিবাসীরা প্রায় খালি হাতে মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়, আমিও তেমনি বেড়াব। তারপর একটু একটু করে আফ্রিকাকে চিনলাম। উবুসকু নামে আমার প্রথম উপজাতি যুবক গাইডটি হলো আমার গুরু। বন্ধুও বলতে পার। জান, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার দু'বছর পরও আমি জানতে পারিনি যে, এমন এক সর্বনাশা যুদ্ধ

চলছে! মোম্বাসা থেকে কিছু দরকারী জিনিস আনতে একজন পোর্টার পাঠিয়েছিলাম। জিনিস এল খবরের কাগজের মোড়কে। সেই কাগজ পড়ে জানলাম ওয়ারল্ড-ওয়ার লেগেছে।'

'বলেন কি! কোনো শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে আপনার দেখাই হয়নি এই দু'বছর?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না। কোনো শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে দেখা হয়নি! রেডিও শুনিনি, খবরের কাগজ পড়িনি। এই বিরাট দেশের কয়েকটি শহর এবং বাঁধা পথঘাটের বাইরে বিদেশী লোক বড় একটা পা বাড়ায় না। আর আমি ঘুরতাম অজানা প্রকৃতি-রাজ্যে। পশু শিকার করে, ছাল বা দাঁত উপজাতির কারো হাতে শহরে পাঠাতাম চিঠি দিয়ে। সে দাম নিয়ে আসতো কিংবা বদলে জিনিস কিনে আনতো। কখনও শিকারের মাংস বা ছালের বিনিময়ে উপ-জাতিদের গ্রাম থেকে প্রয়োজনীয় খাবার যোগাড় করতাম। আর আমার জীবন ধারণের প্রয়োজন ছিল অতি সামান্য। শুধু ঘুরতাম, প্রাণভরে দেখতাম। শিকার করতাম।'

॥ ২ ॥

পরদিন খুব ভোরে উঠে রওনা দিলাম। সারাদিন হাঁটলাম। কয়েকটা বড় বড় তৃণভূমি পেরোলাম। দেখলাম অজস্র জন্তুর ভিড়—নানারকম অ্যান্টিলোপ হরিণ, জিরাফ, জেব্রা, উটপাখি। একটা গাছের ছায়ায় দেখি কর্তা-গিন্নী দুই বাচ্চা নিয়ে এক সিংহ পরিবার। সিংহ-সিংহী পা ছড়িয়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছে, দুটো বাচ্চা পাশে লুটোপাটি করছে। তাদের মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে কতগুলো জেব্রা নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খাচ্ছে। বিল বললেন, 'সিংহদের এখন খিদে নেই। তাই জেব্রারা নির্ভয়। সিংহ অযথা শিকার করে না।'

সমতল তৃণভূমির মাঝে মাঝে এক একটা ছোট পাহাড়। পাহাড়ে গাছপালা খুব কম। ক্ষীণস্রোতা কয়েকটি নদী দেখলাম।

উপজাতি গ্রামেরও দেখা পেয়েছিলাম। মাত্র কয়েকটি গ্রামের কাছে আমরা যাইনি।

তৃতীয় দিন ভূপ্রকৃতির চেহারা বদলে গেল। রুক্ষ উঁচু-নিচু মাঠ। পাথুরে জমি। নেড়া ছোট পাহাড়। বাবলাজাতীয় কাঁটাবন। দু'একটা বাউবাব বেঁটে মোটা শরীরের ওপর ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাস বন কম।

সকাল ৯টা নাগাদ বিল এক জায়গায় থামলেন। চারদিক দেখে বললেন—'এইখানে এক গ্রাম ছিল। আমি যে গ্রামে গিয়েছিলাম তাদের সঙ্গে এই গ্রামের লোকেরই যুদ্ধ হয়। দেখছি এ গ্রামও ধ্বংস হয়ে গেছে।'

চারদিকে উঁচু-নিচু মাটির ঢিপি। শুকনো গর্ত। এগুলি কোনো পরিত্যক্ত গ্রামের চিহ্ন সন্দেহ নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা চলে গেল কেন?'

'বোধ হয় জলের অভাবে। গ্রামের পাশ দিয়ে একটা খাল ছিল। দেখ তার শুকনো খাত। টাঙ্গানিকার এ অঞ্চলে জলের বড় অভাব।'

'যে জায়গায় যাচ্ছি সেটা আর কদ্দূর?' মামাবাবু প্রশ্ন করলেন।

'কাছেই। মাত্র মাইল তিনেক।' আমরা আবার এগোলাম।

লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে আমরা উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। এখানেও জনবসতির চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে। বিল দেখালেন—'ঐ যে কিছু দূরে গ্র্যানিটের স্তূপ দেখা যাচ্ছে, ওর পাদদেশে আমি কালো পাথরের স্তর দেখেছিলাম।'

শিলাস্তূপের কাছে গেলাম। স্তূপের পূর্বদিকে এক বড় গোল চত্বর। চত্বরের পাথরের রঙ কালচে। মামাবাবু দেখে বললেন, 'মনে হয় বহু যুগ আগে এখানে জলাশয় ছিল। কাদামাটি জমে শ্লেট-পাথর হয়ে গেছে। এ ধরনের শ্লেট-পাথরে নানা রকম ফসিল পাওয়া যায়। হঠাৎ কাদায় ডুবে গিয়ে প্রাণীদেহ অবিকৃত অবস্থায়

ক্রমে ফসিল হয়ে যায়।'

চত্বরের মাঝখানে বেশ বড় ফাটল। অনেকখানি গভীর। এইখানেই বোধহয় সেই অতি প্রাচীন পাখির ফসিল পাওয়া গিয়েছিল।

ঠিক হলো আমরা গ্রামের কাছে তাঁবু ফেলব। কারণ ওখানে জল ছিল। একটা বড় পাথরের গর্তে পরিষ্কার টলটলে জল জমে ছিল। কাল থেকে খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ হবে। মামাবাবু চলে গেলেন খাদটা ভাল করে পরীক্ষা করতে। আমরা তাঁবু খাটালাম, রান্নার যোগাড় করলাম। তারপর কফি খেতে খেতে গল্প শুরু হলো।

বিল বললেন, 'আমি যখন কুড়ি বছর আগে এসেছিলাম, তখন জায়গাটা এত রুক্ষ অনুর্বর ছিল না। বেশ ঘাস আর গাছ ছিল।'

'কেন এমন হলো?' সুনন্দ বলল।

'ঠিক জানি না। তবে উপজাতিরা অতিরিক্ত গরু-ছাগল চরিয়ে অনেক সময় ওপরের মাটি আলগা করে ফেলে। বৃষ্টি হলে সেই মাটি ধুয়ে পাথর বেরিয়ে পড়ে।'

বিকেলের দিকে বিল রাইফেল নিয়ে বেরলেন। মাইল দুই-তিন ঘুরে তিনি একটা মস্ত শুয়োর মারলেন। পোর্টাররা শুয়োর-টার ছাল ছাড়িয়ে খণ্ড খণ্ড করে কেটে তাঁবুতে এসে আগুনে ঝলসাতে শুরু করে দিল। বিল বড় একখণ্ড মাংস নিয়ে নিজের হাতে রোস্ট করলেন। আমরা খেলাম। চমৎকার স্বাদ হয়েছিল।

মামাবাবু, আমি, সুনন্দ এবং তিনজন পোর্টার সকালে সেই কালো পাথরের চত্বরে হাজির হলাম। আমাদের সঙ্গে পাথর খোঁড়ার জন্য গাঁইতি, শাবল, ছেনি ইত্যাদি সরঞ্জাম ছিল। মামা-বাবু ফাটলের মধ্যে একটা জায়গা দেখিয়ে দিতে পোর্টাররা পাথর খসাতে শুরু করল। মামাবাবু মাঝে মাঝে পাথর পরীক্ষা করতে লাগলেন। কয়েক জায়গায় এইভাবে খোঁড়াখুঁড়ি চলল।

কয়েকটা শামুকের ফসিল বের হলো। মামাবাবু বললেন, 'সাবধানে কাজ করতে হবে। সময় লাগবে। এ যাত্রায় আমরা যা খুঁজছি পাব কিনা জানি না। তবে জায়গাটায় নানা রকম ফসিল আছে সন্দেহ নেই। এবার না পাই পরে আবার আসব।'

সারাদিন কাজ করে আমরা ফিরে এলাম।

বিল বেরিয়েছিল চারিদিকটা একটু দেখতে। পুরনো গ্রামের চারপাশ ঘুরেছে। একটা ছোট হরিণ মেরে এনেছিল। আমাদের সঙ্গে নানা রকম টিনের খাবার আছে কিন্তু পোর্টারদের টাটকা মাংস চাই। সেদিনও বিল নিজের হাতে মাংসের রোস্ট তৈরি করে খাওয়ালেন। বুঝলাম ডেয়ারিং বিল কেবল নামকরা শিকারী নন, পাকা রাঁধুনীও বটে। বিল বললেন, 'বছরের পর বছর বনে-জঙ্গলে মাঠে-ঘাটে ঘুরেছি। শিকারের মাংসই ছিল একমাত্র খাদ্য। সব রকম জন্তুই খেতাম। আর উপজাতির লোকদের কাছে শিখতাম কোন মাংস কি করে রাঁধতে হয়। তার সঙ্গে সভ্য জগতের মশলাপাতি লাগিয়ে জিভে স্বাদ আনতাম। কেমন হয়েছে রান্না?'

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ।

মামাবাবু পোর্টারদের নিয়ে খাদের ভিতর। আমি ও সুনন্দ ওপরে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখলাম, শিলাস্তূপের পাশ দিয়ে একজন শ্বেতাঙ্গ এই দিকে আসছে। আশ্চর্য হলাম। হঠাৎ এ কোত্থেকে? ভ্রমণকারী না শিকারী? চাপাস্বরে ডাকলাম—'মামাবাবু, এক সাহেব এদিকে আসছে।'

মামাবাবু তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এলেন।

লোকটি ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে এল।

বেশ লম্বা। বয়সে যুবক। সুপুরুষ। শক্ত জোয়ান চেহারা। পরনে খাকি ফুলপ্যান্ট। রঙচঙে হাফসার্ট। মাথায় সোলার টুপি। লোকটি দরাজ গলায় হেঁকে বলল, 'আপনাদের দেখতে এলাম। এখানে বিদেশী কাউকে দেখব ভাবিনি। খোঁড়াখুঁড়ি করছেন?

কিছুর সন্ধান পেয়েছেন নাকি ?'

মামাবাবু জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, একটু পরীক্ষা করছি জায়গাটা। এখনও কিছু পাইনি। আপনি ?'

লোকটি হেসে উঠল। 'তাই তো, এখনও পরিচয় দিইনি। অভদ্রের মত প্রশ্ন করছি। অনেক দিন সভ্যজগতের বাইরে কাটাচ্ছি কিনা, ভব্যতা ভুলে গেছি। হ্যাঁ, আমার নাম টেলর। ব্রুস টেলর। পেশা প্রাণীবিজ্ঞান চর্চা।'

মামাবাবু একটু ভ্রূ কুঁচকে ভাবলেন। তাঁর মুখ দেখলাম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আপনিই কি ফেরোমন বিশেষজ্ঞ ব্রুস টেলর ? যাঁর প্রবন্ধ এই সেদিন পড়লাম 'জুওলজি' পত্রিকায় ?'

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, লেখাটা আমারই বটে। পড়েছেন ? কেমন লেগেছে ?'

মামাবাবু রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'এ লেখাটা তো দারুন হৈ-চৈ ফেলেছে বিজ্ঞানী মহলে। ফেরোমন নিয়ে এত গভীর গবেষণা কেউ করেনি। আপনার আর একটা লেখা বোধহয় বছরখানেক আগে 'জুওলজি' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। সেটাও আমি পড়েছি। ফেরোমন যে জীবজন্তু, বিশেষতঃ কীটপতঙ্গের জাবন-যাত্রাকে এতখানি নিয়ন্ত্রিত করে, আগে কেউ ভাবতে পারেনি। অন্ততঃ ভাবলেও, আপনিই প্রথম প্রমাণ দিয়েছেন। আচ্ছা, আপনি লিখেছেন যে, কয়েক রকম শস্য রক্ষায় কৃত্রিম ফেরোমন দ্বারা 'পেস্ট কনট্রোল' সম্ভব। আপনি কি লেবরেটরীতে তেমন কৃত্রিম ফেরোমন তৈরি করেছেন ?'

টেলর মৃদু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, করেছি। তাদের ফলাফল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে।'

মামাবাবু বললেন, 'যদ্দূর জানি, কয়েকটি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু আপনি যাননি। লোকের ধারণা, আপনি একজন রহস্যময় এবং দাম্ভিক ব্যক্তি। যাক্, আমার ভুল ভাঙ্গল। আর আপনি যে বয়সে এত নবীন, সেটাও ভাবতে পারিনি।'

টেলর বললেন, 'আমার পরিচয় তো পেলেন। এবার আপনাদেরটা জানতে পারি কি ? মনে হচ্ছে, আমরা একই লাইনের লোক।'

মামাবাবু বললেন, 'প্রায় তাই। আমি ভারতীয়, কলকাতায় প্রাণিবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করি। যদিও বিদ্যা অতি সামান্য। নাম—নবগোপাল ঘোষ। এটি আমার ভাগ্নে সুনন্দ। আর এই ছেলেটি সুনন্দর বন্ধু অসিত। আমাদের সঙ্গে আরও একজন আছেন। আমাদের গাইড। বিখ্যাত শিকারী মিঃ হার্ডি। তিনি আপাততঃ বন্দুক নিয়ে কিঞ্চিৎ খাদ্য সংগ্রহ করতে বেরিয়েছেন।'

টেলর চোখ বড় বড় করে বললেন, 'বাপ্ রে, আপনি

প্রোফেসর ! তবে তো বুঝে-শুনে কথা বলতে হবে।'

মামাবাবু বললেন, 'আপনি তো আমার ছাত্র নন যে, নম্বর কাটব। বরং আমি আপনার ছাত্র হতে রাজী আছি।'

টেলর বললেন, 'দলবল বেঁধে এসেছেন যখন, তখন এখানে কিছু পাবার আশা আছে মনে হচ্ছে। কিসের ফসিল ? অবশ্য ঐ ব্যাপারে আমার বিশেষ উৎসাহ নেই।'

মামাবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, না, সঠিক কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বেরোইনি। আফ্রিকায় এসেছিলাম কয়েকটা লেকচার দিতে। স্রেফ কেতাবী বক্তৃতা। হাতে ক'দিন সময় পেলাম তাই বেরিয়ে পড়লাম। আফ্রিকা দেখা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সামান্য অনুসন্ধান। যদি লেগে যায় বরাতে, নাম-টাম হয়ে যায় ! এত বয়সেও তো তেমন কিছু করে উঠতে পারলাম না। এই পাথরের স্তরটা দেখে মনে হলো ফসিল থাকতে পারে। তাই খুঁড়ছি। আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে কত বৈজ্ঞানিক প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীব-জন্তুর ফসিল পেয়েছে। তবে আমার আসল লক্ষ্য প্রস্তরচিত্র। আদিম মানবের আঁকা ছবি।'

মামাবাবুর আসল লক্ষ্য শুনে ক্রুস টেলরের মতো আমরাও চমকালাম, এ উদ্দেশ্য তো কখনও টের পাইনি। সুনন্দ ও আমি চোখাচোখি করলাম। বুঝলাম, টেলরের কাছে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য চেপে যাচ্ছেন মামাবাবু।

টেলর চিন্তিতভাবে বললেন, 'রক-পেন্টিং ? রকপেন্টিং তো উত্তরে আছে শুনেছি। টাঙ্গানিকার কলডোয়া, কিলোসা, ফেঙ্গা পর্বতে অনেক প্রাচীন চিত্র আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু এধারে কৈ—'

মামাবাবু বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ, এধারে পাওয়া যায়নি, সেই জন্যেই তো খুঁজছি। পেলে নাম হবে।'

'পেন্টিং আর কোথায় খুঁজছেন ? আপাততঃ তো দেখছি ফসিলের সন্ধানে লেগে গেছেন।' টেলরের কণ্ঠে যেন সামান্য

রহস্য।

মামাবাবু হাসেন। 'দেখি কয়েকটা দিন এখানে কাজ করে। কিছু না পাই তো চলে যাব।'

'কোন দিকে যাবেন?' টেলর বলেন।

'ভাবছি দক্ষিণ-পশ্চিমে যাব।'

'দক্ষিণ-পশ্চিমে?' টেলর যেন আঁতকে ওঠেন। 'সি-সি বেল্টের মধ্য দিয়ে যাবেন? সাধ করে বিপদ ডেকে আনবেন? তাছাড়া ওদিকে কোন রক-পেন্টিং আছে বলে তো জানি না। বরং সোজা পশ্চিমে যান। ওদিকে অনেক ছোট-খাট পাহাড় আছে। হয়তো পেন্টিং দেখতে পাবেন।'

'দক্ষিণ-পশ্চিমে বুঝি সি-সি মাছির এলাকা? হুঁ। তাহলে তো বিপদজনক রাস্তা।' মামাবাবু চিন্তিত হয়ে বললেন, 'আপনি ও এলাকাটা চেনেন?'

'হ্যাঁ, কারণ আমি আপাততঃ সি-সি ফ্লাই নিয়ে কিঞ্চিৎ গবেষণা করছি।'

'তাই নাকি?' মামাবাবু উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

টেলর গম্ভীর স্বরে বলেন, 'টাঙ্গানিকার এই অভিশাপকে তাড়ানো যায় কিনা চেষ্টা করছি। আর এ ব্যাপারে ফেরোমন কতটা সাহায্য করতে পারে পরীক্ষা করছি।'

মামাবাবু হঠাৎ বললেন, 'আপনি এখানে কি কোন রিসার্চের কাজে রয়েছেন? কাছাকাছি কোথাও তাঁবু ফেলেছেন?'

টেলর বললেন, 'না, তেমন কোনো কাজে আসিনি। শ'খানেক মাইল দূরে এক সি-সি ফ্লাইবেল্ট থেকে ফিরছিলাম, পথে রেস্ট নিচ্ছি। আর আশপাশের ঝোপগুলো পরীক্ষা করছি। কালই পাততাড়ি ওঠাতাম, তবে ইচ্ছে হচ্ছে আপনাদের যখন পেয়ে গেলাম, কাল একবার আড্ডা মারতে আসব। কথা বলার লোক পাই না। পরশু পালাব।'

'আপনার তাঁবু কোন দিকে?'

'ঐ দিকে। মাইল দুই দূরে। আচ্ছা, আজ চলি। কাল আসব।' টেলর যেন একটু ব্যস্ত হয়ে পা বাড়ালেন। বোধহয় কোন কাজের কথা মনে পড়ে গেল।

লম্বা লম্বা পা ফেলে টেলর ফিরে চললেন। শিলাস্তূপের গা ঘেঁষে বাঁক নেবার আগে একবার ফিরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে হাত নাড়লেন। তারপর পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সুনন্দ বলে উঠল, 'এর লেখাই সেদিন পড়ছিলেন, না মামাবাবু?'

'হ্যাঁ। অদ্ভুত লোক। দু'এক বছর আগেও কেউ এর নাম জানত না।

'পর পর কয়েকটা লেখায় বৈজ্ঞানিক মহলে আলোড়ন তুলে দিয়েছে। ভাল করে এর পরিচয়টা অবধি কেউ জানে না। তবে লেখা পড়ে মনে হয়, লোকটি অতি পণ্ডিত। দীর্ঘ সাধনা আছে। পঙ্গপালের ফেরোমন যে তাদের বংশবৃদ্ধির জন্য দায়ী, এ এক আশ্চর্য আবিষ্কার। আরও কয়েকটি কীটপতঙ্গের জীবনযাত্রায় তাদের ফেরোমন কিভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়, টেলর লেখায় তার উল্লেখ করেছেন। তবে বিশদভাবে কিছু বলেননি। লিখেছেন, তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। একসপেরিমেণ্ট শেষ হলে বিষয়টির ওপর একটি প্রামাণিক বই লিখবেন। পৃথিবীর অনেক বৈজ্ঞানিক টেলরের গবেষণার ফলাফল জানার জন্য অধীর অপেক্ষায় আছেন।'

তাঁবুতে ফিরে দেখলাম, বিল আরাম করে কফি খাচ্ছেন। আমাদের দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'হ্যালো সায়ান্টিস্ট্স, তারপর, পাখির গ্রেট গ্রেট গ্রেট এনসেস্টরের ফসিলের হদিস মিলল?'

মামাবাবু বললেন, 'অত সোজা নাকি? সময় লাগবে। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?'

'একটা রাউণ্ড মেরে এলাম মাইল কয়েক।'

বিলকে টেলরের কথা বলা হলো। কালকে আবার টেলর

আসবেন শুনে বিল বললেন, 'খেয়েছে। ও সব বৈজ্ঞানিক আলোচনার মধ্যে আমি নেই। কাল আমি সন্ধ্যের পর ফিরব।'

আমরা আশ্বাস দিলাম, 'কোন ভয় নেই। টেলর মোটেই খিটখিটে পণ্ডিত নন। দিব্বি হাসি-খুশি, আমুদে।'

'একা-একা ঘুরতে আপনার ভালো লাগে?' একটা মতলব ছিল আমার প্রশ্নে।

বিল বললেন, 'একজন সঙ্গী পেলে তো ভালই লাগত। পাচ্ছি কৈ? তুমি আসবে?'

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। আসলে আমারও রোদে দাঁড়িয়ে পাথর কাটা দেখতে আগ্রহ ছিল না। বিলের সঙ্গে ঘোরায় কত মজা!

সুনন্দ আর কি করে? কটমট করে আমাকে দেখে নিল। কিন্তু সে প্রাণীবিজ্ঞানের ছাত্র। আমার মত ফাঁকি দেওয়া তার শোভা পায় না।

রাত্তিরে খাবার সময় মামাবাবু বললেন, 'সবাই মনে রেখো আমাদের এখানে আগমনের আসল উদ্দেশ্য যেন টেলর টের না পায়।'

'কেন? টেলরকে জানাতে আপত্তি কিসের?' আমি প্রশ্ন করলাম। 'উনি তো অন্য বিষয় নিয়ে কাজ করছেন। বললেন তো ফসিলের ব্যাপারে ওঁর আগ্রহ নেই।'

'মুখে বলছেন বটে, কিন্তু ওঁর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, বেশ আগ্রহ আছে। মিসিং লিংক-এর মত গুরুত্বপূর্ণ ফসিল এখানে পাবার সম্ভাবনা আছে বলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমরা তো আপাততঃ ক'দিন পরে চলে যাব। হয়তো খালি হাতে ফিরতে হবে, তারপর উনি যদি এসে ফসিল খুঁজতে শুরু করেন?'

বিল হো-হো করে হেসে উঠলেন। 'বাঃ, আপনারা বৈজ্ঞানিকরা তো সহজ মানুষ নন। কত লুকোচুরি!'

'হ্যাঁ,—তা তো আছেই। বৈজ্ঞানিক জগতে জোচ্চুরির অভাব

নেই। কত লোক অন্য লোকের গবেষণার ফল মেরে দিয়ে নিজের নামে প্রকাশ করে বিখ্যাত হয়ে গেছে। তাই সাবধান হতে হয়।'

॥৩॥

পরদিন বিলের সঙ্গে টৈ-টৈ করলাম। যেদিকে ব্রুস টেলরের তাঁবু সেদিকে যাইনি। মামাবাবু বারণ করেছিলেন। নিজে থেকে যখন ডাকছেন না, তখন যাওয়া উচিত নয়। হয়তো ব্যস্ত থাকবেন, তাছাড়া বেড়াবার পক্ষে ওদিকটা সুবিধের নয়! উঁচুনিচু জমি। খাঁজ খাঁজ চড়াই-উৎড়াই। আমরা অন্য দিকে গেলাম। বিল একটা পায়ে-চলা পথ আবিষ্কার করলেন। বললেন, 'সারা আফ্রিকায় বন-প্রান্তরে এমনি অজস্র পায়ে-চলা পথ দেখতে পাবে। পথগুলির শেষে পাবে হয় কোন গ্রাম কিংবা জলাশয়। ঝর্ণা বা নদী।'

ঠিকই বলেছিলেন বিল। কয়েক মাইল এগিয়ে দেখলাম এক ছোট জলাশয়। কিন্তু কাছে যেতে পারলাম না। কারণ একপাল হাতী সেখানে মহানন্দে জলকেলি করছে। একটা একাসিয়া গাছের পাশে দাঁড়িয়ে দূরবীণ দিয়ে সেই মজার দৃশ্য দেখতে লাগলাম। মস্ত মস্ত প্রাণীগুলো ছোটছেলের মতো এ ওর গায়ে জল ছিটোচ্ছে। কাদা ছুঁড়ছে। বেশ কয়েক ঘণ্টা সেখানে বসে রইলাম। ওখানে বসেই খেয়ে নিলাম। বিকেলে তাঁবুতে ফিরলাম। একটুক্ষণ পরে মামাবাবু ও সুনন্দর সঙ্গে এলেন টেলর। টেলরের সঙ্গে বিলের আলাপ হলো। একটু পরেই দেখলাম দু'জনে আফ্রিকার গল্পে মেতে উঠেছেন। টেলর আফ্রিকার বহু দুর্গম অঞ্চলে ঘুরেছেন। বহু উপজাতির রীতি-নীতি জানেন।

কিভু হ্রদের তীরবাসী ওয়াটুতসি উপজাতির কথা উঠতে দু'জনে ভারি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

বিল বললেন, 'ভারি সৌখিন জাতি। কি লম্বা! ওদের নাচ দেখেছেন?'

'দেখেছি। দারুণ জমকালো ব্যাপার। মাথায় সিংহের কেশর। পরনে হরিণের চামড়া। গায়ে রুপোর গয়না। পায়ে ছোট ছোট ঘন্টা বাঁধা। নাচের তালে তালে কি বিরাট লাফ।'

বিল বললেন, 'সত্যি, লাফাতে পারে বটে। ওদের ন্যাশনাল স্পোর্টস হলো হাইজাম্প। একবার দেখেছিলাম, ঘটা করে হাইজাম্প হচ্ছে। বিশ্বাস করুন, গ্রামের অর্ধেকের বেশি জোয়ান পুরুষ ছ'ফুট হাইট লাফ দিয়ে পেরিয়ে গেল। কায়দা-টায়দার বালাই নেই। স্রেফ ছুটে এসে বেড়া ডিঙোনো লাফ। ওদের ট্রেনড্ করলে নির্ঘাৎ অলিম্পিক জিতবে।'

হঠাৎ টেলর হো-হো করে হাসতে লাগলেন।

'কি হলো?'

'ওয়াটুতসি বৌদের কথা মনে পড়ে গেল। উঃ, কি মোটা!'

বিলও হাসেন। 'রাইট। কেবল খাইয়ে খাইয়ে বৌদের মোটা করে। যত মোটা তত নাকি সুন্দরী। বেচারা বৌগুলো শেষে ভাল করে হাঁটতে পারে না। খেতে না চাইলে স্বামী শাশুড়ী পিটিয়ে, জোর করে খাওয়ায়! বুঝুন যন্ত্রণা!'

আমি ও সুনন্দ মুগ্ধ হয়ে তাঁদের গল্প গিলছিলাম, তবে মামাবাবুর ইচ্ছে ছিল টেলরকে গবেষণা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু টেলর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন। মামাবাবু বললেন, 'কখনও ইণ্ডিয়ায় গেলে খবর দেবেন। দেখা করব।'

'নাঃ। এখন বিদেশে যাবার ইচ্ছে নেই। আফ্রিকায় অনেক কাজ বাকি।' টেলর উঠে পড়লেন, 'চলি আজ। আর বোধহয় আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না, কাল চলে যাচ্ছি। বড় আনন্দে কাটল বিকেলটা।'

'কোন দিকে যাবেন?' মামাবাবু প্রশ্ন করলেন।

'মাইল দশ দূরে আমার এক আস্তানা আছে। সেখানে ক'দিন থাকব।'

টেলর সেদিন একজন উপজাতীয় সঙ্গী এনেছিলেন। সে

আমাদের পোর্টারদের সঙ্গে বসে খুব আড্ডা দিচ্ছিল। টেলর ডাকলেন—'গোরো, চল।'

সন্ধ্যা নেমে গেছে। গোরো একটা মশাল জ্বালল। দু'জনে ফিরে চলল, ক্রমে পাথরের আড়ালে মশালের আলো অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিল মন্তব্য করলেন, 'আশ্চর্য লোক। ইনি চার দেওয়ালের মধ্যে দিনের পর দিন ঘোর গবেষণা করছেন, ভাবা শক্ত। বরং ভ্রমণকারী বা অ্যাডভেঞ্চারার বললে মানায় বেশি।'

॥ ৪ ॥

টেলর চলে যাবার পর মামাবাবু নিশ্চিন্তে কাজ সুরু করলেন।

রাত্রে মামাবাবু বললেন, 'জানেন বিল, পোর্টারদের হাবভাব সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

'কেন?'

'লোকগুলো মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছিল। পাথরের টিলাটার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। কেমন ভয়-ভয় ভাব।'

'ভয়! কেন, স্তূপটাকে ভয় পাবার কি আছে? ওখানে কোন বন্য জন্তু থাকার কথা নয়। বেশ, কাল আমি যাব। রহস্যটা বোঝার চেষ্টা করব।'

পরদিন বিল মামাবাবুদের সঙ্গে গিয়ে খাদের কাছে একটা পাথরে বসে পাইপ টানতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ এক আর্তনাদ। তাড়াতাড়ি খাদের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখি একজন পোর্টারের হাত থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে। ফার্স্ট-এড্-এর বাক্স সঙ্গে ছিল। লোকটির হাতে ব্যাণ্ডেজ করে দিলাম। সামান্য কেটেছে।

মামাবাবু জানালেন, 'একজনের হাত থেকে গাঁইতি ছুটে

গিয়ে লেগেছে। ভাগ্যিস মাথায় লাগেনি। লোকগুলো কেবল নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। অসাবধান হয়ে কাজ করছে। তাই ফস্কেছে।'

পোর্টাররা এদিকে কাজ বন্ধ করে খাড়া দাঁড়িয়ে গেল। 'কি ব্যাপার ? তোমাদের তো লাগেনি, সাবধানে কাজ কর।'

তারা মাথা নেড়ে বলল, 'না, বানা (সোয়হিলি ভাষায়— হুজুর), এখানে আমরা খুঁড়তে পারব না।'

'কেন ?'

'এই পাহাড়ে এক পুণ্যাত্মা থাকেন। তিনি বিরক্ত হচ্ছেন। এবার অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটেছে। এরপর বিষম বিপদে পড়ব।'

'পুণ্যাত্মা ? তিনি আবার কে ?' বিল বললেন।

'আছেন বানা। তিনি গোসাপের রূপ নিয়ে আছেন। বহুকাল এই জায়গায় বাস করছেন। তাঁর দয়ায় এ অঞ্চলে বৃষ্টি হয়। বিষাক্ত মাছিরা এখানে আসে না।'

'কে বলল তাঁর কথা ? তোমরা তো এ অঞ্চলের লোক নও।'

'গোরো, হুজুর।'

'বুঝুন কাণ্ডটা', বিল বললেন। 'টেলরের সঙ্গীটি কেমন উপকার করে গেছে। এরা খুব সাহসী, কিন্তু বড় সংস্কারাচ্ছন্ন। দেবতা, অপদেবতা সবাইকেই বেজায় ভয়। এখন এদের দিয়ে এখানে কাজ করানো খুব শক্ত ব্যাপার।'

বিল অনেক চেষ্টা করলেন। ভয় দেখালেন। লোভ দেখালেন। কিন্তু পোর্টাররা অনড়। শেষে বললেন, 'বেশ, খুঁড়তে হবে না। আপাততঃ ক'দিন এখানে থাক। আমি অন্য লোক খুঁজছি, তখন তোমাদের ছেড়ে দেব।'

বিল আমাদের বললেন, 'দেখি কাল আর একবার চেষ্টা করব। ভাল পুজোটুজো দিলে যদি হয়।'

কিন্তু পরদিন ভোরে উঠে আবিষ্কার করলাম সব ক'জন পোর্টার

পালিয়েছে। বোধহয় মাঝরাতে সরে পড়েছে। এরা কিছু টাকা আগাম নিয়েছিল। হয়তো ভাবল, আমরা যদি জোর করে কাজ করাই, তাই পালিয়েছে।

আমরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। ভারি ভারি শাবল, গাঁইতি ইত্যাদি খোঁড়ার যন্ত্র। মাসখানেকের রসদ। মামাবাবুর বৈজ্ঞানিক জিনিসপত্র। এত মাল চারজনে বয়ে নিয়ে ফিরে যাওয়াও তো অসম্ভব। তাছাড়া এদ্দূর এসে কিছু চেষ্টা না করে ফিরে যাব? এত আয়োজন বৃথা যাবে?

বিল রাইফেল ঘাড়ে বেরলেন। যদি কাছাকাছি কোন গ্রাম থেকে লোক যোগাড় করা যায়। ফিরলেন সন্ধ্যের সময়।

'নাঃ, পেলাম না। প্রায় দশ মাইল ঘুরে একটা গ্রাম পেয়েছিলাম, কিন্তু তারাও রাজী হলো না এখানে কাজ করতে।'

পরামর্শ সভা বসল, কি করা যায়।

বিল বললেন, 'এখন একমাত্র উপায় বৈজ্ঞানিক টেলর। উনি এ অঞ্চল ভাল করে চেনেন। হয়তো চেষ্টা করলে পোর্টার যোগাড় করে দিতে পারবেন। মানে, এরা যাতে এখানে কাজ করে তার ফন্দী বাতলে দিতে পারবেন।'

'আমাদের এত খোঁড়ার আগ্রহ দেখে টেলরের এই জায়গা সম্বন্ধে সন্দেহ বাড়বে না তো?' আমি বললাম।

'কি উপায়!' মামাবাবু জানালেন।

'কিন্তু টেলরের আস্তানায় পৌঁছব কি করে?' সুনন্দ বলল।

'পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করব', বিল বললেন। 'কিছু কিছু ট্র্যাকারের বিদ্যে আমার জানা আছে। মাত্র ছ'দিন আগে ওরা ফিরে গিয়েছে। চিহ্ন পাওয়া যাবে। কাল ওদের তাঁবু কোথায় ছিল খুঁজে বার করব। তারপর অনুসরণ আরম্ভ হবে। ওর আস্তানা তো বেশি দূরে নয়।'

টেলরের তাঁবুর চিহ্ন খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়নি। একটা বড় গাছের তলায় দেখলাম খুঁটি পোঁতার গর্ত, পোড়া কাঠ।

কাছেই এক ছোট পাহাড়। বিল মাটির ওপর চোখ রেখে ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'চলুন, এগোন যাক। ওদের ট্র্যাক পেয়েছি। তবে টেলর যাবার আগে আর একদল এখান থেকে একই পথে গিয়েছিল। পায়ের চিহ্ন কতগুলো কিছু পুরনো। রোদের তেজ বাড়ার আগে রওনা দিই। যতটা পারি জিনিস বয়ে নিয়ে যাই, বাকি কোন গুহার মধ্যে লুকিয়ে রেখে যাই।'

॥ ৫ ॥

বিল অনেকটা সামনে এগিয়ে চললেন। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মাটির ওপর। আমরা পিছনে চললাম। বিল বললেন, 'আমায় ট্র্যাকারের বিদ্যে শিখিয়েছিল এক ঝানু মাসাই। সে যে-কোন পশু বা মানুষের পায়ের চিহ্ন ধরে তাকে মাইলের পর মাইল অনুসরণ করতে পারত। পাথর বা শক্ত মাটির বুকেও ঠিক তার চিহ্ন খুঁজে বের করত। চিহ্ন দেখে বলে দিত প্রাণীটির ওজন কত, বয়স ইত্যাদি খুঁটিনাটি। আমিও কিছুটা পারি, তবে তার মত নয়।'

ঘণ্টা দুই এগোবার পর বিল সহসা থামলেন। মুখে আঙুল দিয়ে আমাদের চুপ করতে ইঙ্গিত করলেন। কানে কতগুলো বিচিত্র শব্দ এল। খট্‌খট্, ধুপধাপ্। নিঃশব্দে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়ালাম। বন্য-প্রকৃতি রাজ্যের এক অদ্ভুত ছবি আমাদের সামনে ফুটে উঠল।

এক টুকরো সমতলভূমিতে দুটো প্রকাণ্ড পুরুষ-হরিণ মত্ত হয়ে যুদ্ধ করছে! খানিক দূরে সাত-আটটা মেয়ে-হরিণ ও তিন-চারটে বাচ্চা। মেয়ে-হরিণগুলো কৌতূহলী চোখে লড়াই দেখছে। কখনও আবার নির্বিকারভাবে ঘাস-পাতা চিবুচ্ছে।

বিল বললেন, 'ইলাণ্ড। কে দলপতি হবে তাই নিয়ে লড়াই লেগেছে। যতক্ষণ না একটা হেরে দল ছেড়ে পালাবে ততক্ষণ যুদ্ধ

চলবে।'

এই দ্বন্দ্ব কখন আরম্ভ হয়েছিল জানি না। আরও আধঘণ্টা চলল। ক্রমে একটা হরিণ পিছু হটতে লাগল। সে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। একবার গুঁতো খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। অন্য হরিণটা তাকে শিং-এর ধাক্কায় ঠেলে নিয়ে চলল। শেষে পরাজিত হরিণটি পিছন ফিরে দৌড় লাগাল। বিজয়ী কয়েক কদম তার পিছনে তেড়ে গিয়ে, দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

ঠিক এই সময় আমাদের ডান ধারে এক ঝোপের ভিতর থেকে একজন বিচিত্র লোক মাথা তুলে দাঁড়াল। ঢেঙ্গা, রোগা লম্বাটে

মুখ। ঘাড় অবধি রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল। মুখভর্তি গোঁফ-দাড়ি। গায়ে ময়লা জামা ও কালো প্যাণ্ট। কাঁধে তিন-চারটে বড় বড় থলি। হাতে একটা মুভি ক্যামেরা। কে রে বাবা! হিপি নাকি? আফ্রিকার এই গহনে?

লোকটি নিশ্চয় আমাদের আসা দেখেছিল? একগাল হেসে হেঁকে বলল, 'হাল্লো, কেমন দেখলে? ভয় হচ্ছিল, বেরসিকের মত গুলি করে বসবে বুঝি। খুব লড়েছে। ফার্স্ট ক্লাস ছবি উঠল।'

লোকটির গলা শুনে হরিণের দল চকিতে দৌড়ে হাওয়া হয়ে গেল।

লোকটি আমাদের কাছে এসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে নিজের পরিচয় দিল—'জুসেপি আন্তোনিও। সখের ফটোগ্রাফার। তোমরা? শিকারী নাকি?'

আমরাও নিজেদের পরিচয় দিলাম। বিল বললেন, 'অতগুলো ঝুলি কেন কাঁধে! পোর্টার নেই?'

'ছিল একজন। পালিয়েছে। একজনকে ধার দাও না তোমরা।'

'আরে আমাদেরও তো পালিয়েছে। পোর্টারের খোঁজেই তো চলেছি।'

শুনে আন্তোনিওর কি হাসি—'বাঃ বাঃ। বেশ বেশ। তা তোমাদের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটানো যাক, আপত্তি আছে? তোমাদের লোক যোগাড় হলে আমারও হয়ে যাবে। তাছাড়া অনেকদিন কথা বলার লোক পাইনি। একটু আড্ডা দেওয়া যাবে। তবে আমি কিন্তু বাপু আইন মেনে চলতে পারব না, বলে রাখছি।'

'মানে?'

'মানে, ঠিক সময় খাওয়া, শোওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশে ভাল চাকরি করতাম। সময়মত অফিস যেতে হতো বলো কাজ ছেড়ে দিলাম। আগে অবসর সময়ে ফটোগ্রাফি করতাম, এখন

মনের সুখে দিনরাত ঐ নিয়ে মেতে আছি। এ দেশটাও চমৎকার। সাবজেক্টের অভাব নেই। কতরকম জন্তু-জানোয়ার, কীটপতঙ্গ।'

আন্তোনিও বয়সে যুবক। তার হাতমুখ নেড়ে চুল ঝাঁকিয়ে কথা বলার ধরন ভারি মজার। বোঝা যায়, লোকটি বেজায় দিলখোলা। সুনন্দ রসিকতা করল—'আপনার নিশ্চয় অনেক পয়সা! চাকরি ছেড়ে দিলেন!'

'মোটেই না।'

'তাহলে চলে কি করে?'

'মাঝে মাঝে দেশে ফিরে ছবি বিক্রি করি। আরে, হলিউডের সিনেমা কোম্পানিগুলো তো আমার ছবি কেনার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। জীব-জন্তুর এমন একসান্ ফটোগ্রাফি কি সহজে পাওয়া যায়?'

সুনন্দ বলল, 'মিস্টার আন্তোনিও, প্রথম আলাপে আপনি আশা করি আমাদের একটা ছবি তুলবেন। অসিতের চেহারাটা পছন্দ না হলে আমার তুলুন। বলেন তো পোজ্ করি।'

আন্তোনিও গম্ভীরভাবে বলল, 'সরি। মানুষের ছবি তুলে আমি ফিল্ম নষ্ট করি না।'

সুনন্দর দমে যাওয়া মুখ দেখে আমি সুযোগ বুঝে ফোড়ন কাটলাম, 'মিস্টার আন্তোনিও। আপনি অনায়াসে ওর ছবি নিতে পারেন। ওকে মানুষ ভাববার কোন কারণ নেই।'

মামাবাবু ও বিল হো-হো করে হেসে উঠলেন। আন্তোনিও আমার কথা শুনে যেন কথাটা যাচাই করবার জন্যে সুনন্দকে একবার আপাদমস্তক জরিপ করে নিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ছবি তুলল না।

আবার চললাম। বিল সামনে, আমরা তাকে অনুসরণ করছি। আন্তোনিও প্রায়ই দলছাড়া হয়ে পড়ছিল। কখনো গাছের ওপর বাঁদরের দাঁত খিঁচুনি দেখে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। কখনো বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতি দেখে ক্যামেরা তাক করছিল। আবার ছুটতে

ছুটতে এসে আমাদের সঙ্গ ধরছিল।

আট-নয় মাইল যাবার পর বিল দাঁড়ালেন। বললেন, 'ঐ দূরে ছোট ছোট ঝোপের ঘন জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, ওখানে নিশ্চয়ই সি-সি ফ্লাই আছে। দেখ, বনের চারপাশের জমির ঘাস পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। সমস্ত ঝোপঝাড় কেটে ফেলা হয়েছে। সি-সি মাছি ঐ রকম বনে আড্ডা গাড়ে। বড় পাতাবহুল গাছের বন বা ছোট ছোট ঘাসবনে থাকে না। এখানকার লোকে তাই সি-সি ফ্লাই এলাকার চারপাশের বড় ঘাস পুড়িয়ে, ঝোপঝাড় কেটে দেয়। যাতে এই মাছি ছড়িয়ে না পড়ে। টেলর দেখছি বনটা এড়িয়ে ডান পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে।'

আমরা চক্রাকারে সি-সি মাছির এলাকাটা ঘুরে বনের উল্টো দিকে উপস্থিত হলাম। দূরে বড় বড় গাছে ছাওয়া এক খণ্ড সবুজ বন দেখা যাচ্ছিল। বিল সোজা সেই দিকে এগিয়ে গেলেন।

বনের মধ্যে এক পায়ে চলা পথ ধরে মাত্র পঞ্চাশ গজ মত ঢুকেই দেখি বন শেষ হয়ে গেছে। সামনে ছোট ছোট ঘাসে ঢাকা পরিষ্কার এক টুকরো জমি এবং তার ভিতর উঁচু পাঁচিলে ঘেরা একটি মাটির বাড়ি। মনে হলো, বড় বড় গাছের বেড়া দিয়ে বাড়িটিকে যেন ইচ্ছে করেই লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

বিল বললেন, 'টেলর ঐ বাড়িতে ঢুকেছে।'

প্রাচীর সংলগ্ন মস্ত কাঠের গেটটা একটু ফাঁক করা ছিল। আমরা ভিতরে ঢুকে পড়লাম। বাড়ির দরজায় কয়েকবার করাঘাত করতে শুনলাম ভিতরে খট্‌খট্ আওয়াজ। দরজা খুলে একটি মুখ উঁকি মারল। সে মুখ টেলরের নয়।

পুরু চশমার কাঁচে ঢাকা দুটো বিস্ফারিত রাগী চোখের সামনা-সামনি হয়ে আমরা চমকে দু'পা পিছিয়ে গেলাম।

মুখখানা এক বৃদ্ধের। মাথাজোড়া টাক। টিয়াপাখীর মত নাক। তার বাঁ গালের ওপর এক বীভৎস চিহ্ন। পোড়ার দাগ।

গালের মাংস কুঁচকে মুখের রূপ বিকৃত করে তুলেছে।—'কাকে চাই ?' বৃদ্ধ কড়া গলায় প্রশ্ন করল।

'এখানে মিস্টার টেলর থাকেন ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে এখন নেই।'

'কোথায় গেছেন ?'

'জানি না।'

'কবে ফিরবেন ? আমাদের বিশেষ দরকার।'

'ও।' বৃদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দেখল। তারপর বলল, 'বোধহয় দু' একদিনের মধ্যে। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?' বৃদ্ধ দরজার ফাঁকটা কমিয়ে আনল।

'বলবেন, ঘোষ এসেছিল, আর বিল। একটু দরকার।'

'বেশ, বলব। জাম্বো কোথায় গেলি। যত উটকো লোক ঢুকে পড়ে—' বলতে বলতে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। চকিতে দেখলাম লোকটির হাতে একটি লাঠি। সে লাঠিতে ভর দিয়ে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

আমরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। টেলরের আস্তানায় এ কোন বদমেজাজী বুড়ো ? টেলরের কোন অ্যাসিস্‌টেন্ট নাকি ? মনে হয়, লোকটার মাথার গোলমাল আছে। যা হোক, টেলর ফেরা অবধি অপেক্ষা করতে হবে।

পাঁচিলের বাইরে একটি উপজাতীয় লোকের সঙ্গে দেখা। এই বোধহয় জাম্বো। সে আমাদের অবাক হয়ে দেখছিল। বিল বলল, 'তুমি টেলরের কাছে কাজ কর ?'

'হ্যাঁ, বানা।'

'টেলর কবে ফিরবেন ?'

'দু' একদিনের মধ্যে।'

'আচ্ছা, এখানে খাবার জল কোথায় পাওয়া যাবে, কাছাকাছি ?'

'ঐ দিকে একটা ঝর্ণা আছে।' সে বাড়ির পিছন দিকে

দেখালো।

'বেশ। টেলর এলে বলবে তার বন্ধুরা ওখানে অপেক্ষা করছে। আমরা তাঁবু ফেলছি।'

লোকটি ঘাড় নেড়ে জানাল—'বলব।'

হঠাৎ—কোত্থেকে আন্তোনিও হাজির হলো। সে কখন সটকে পড়েছিল খেয়াল করিনি।—'পোর্টারের ব্যবস্থা হলো?'

বললাম, 'টেলর নেই। দু' একদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

'বেশ বেশ। জায়গাটা খাসা। অনেক সাবজেক্ট পাওয়া যাবে।' সে উৎসাহিত ভাবে চারদিক দেখল।

ঝর্ণা খুঁজে পেতে অসুবিধা হলো না। বাড়ির আধ মাইলের মধ্যেই। কয়েকটা বড় বড় পাথরের চাঙ্গড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে ক্ষীণ জলস্রোত। পরিষ্কার টলটলে জল নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। স্রোত ক্রমশঃ চওড়া হয়ে এঁকে বেঁকে কিছুদূরে ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। উৎসের কাছেই আমরা তাঁবু ফেললাম।

মামাবাবু বেজায় গম্ভীর হয়ে গেলেন। কথাবার্তা নেই, কি জানি ভাবছেন। তাঁবু খাটিয়ে, রান্নার যোগাড় করছি, হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—'মনে পড়ছে—কার্লো! ডঃ ফিলিপ কার্লো!'

'কার্লো কে?'

'ঐ বৃদ্ধ। কেবল ভাবছি, কোথায় দেখেছি। সেই নাক। কথা বলার ভঙ্গী। গলার স্বর। বড্ড চেনা। তবে দশ বছর আগে দেখেছিলাম। তখন মাথায় অনেক চুল ছিল; আর গালের পোড়া দাগটা ছিল না। এখন ভীষণ বুড়োটে হয়ে গেছেন। কিন্তু কার্লো এখানে কি করছেন?'

'কার্লো কে?' বিল বললেন।

'একজন প্রাণীবিজ্ঞানী। ট্রপিকাল অঞ্চলের পোকামাকড়-বিশেষজ্ঞ। কলকাতায় এক কনফারেন্সে দেখেছিলাম। বেজায় রাগী। তবে অসাধারণ পণ্ডিত। শুনেছিলাম, তিনি ট্রপিকাল

অরণ্যে প্রচুর ঘোরেন। কয়েক বছর ওঁর কোন লেখা আমার চোখে পড়েনি। কার্লো কি টেলরের সঙ্গে রিসার্চ করছেন?'

বদরাগী বুড়ো কার্লোর রহস্য আমাদের সবার মনে কৌতূহল জাগাল। কিন্তু টেলরের সঙ্গে দেখা না হলে এ রহস্য সমাধানের উপায় নেই।

॥ ৬ ॥

ব্রুস টেলর পরদিন ভোরেই হৈ-হৈ করে হাজির হলেন।

'কি ব্যাপার? আপনারা? বললেন যে পশ্চিমে যাবেন?'

'বিশেষ প্রয়োজনে এলাম। আপনার সাহায্য দরকার।'

'কিন্তু এলেন কি করে?'

'আপনার পদচিহ্ন অনুসরণ করে। বিল নিয়ে এসেছেন।'

'বটে, বটে! তা দরকারটা কি শুনি?'

মামাবাবু আমাদের পোর্টারদের কাহিনী শোনালেন।

শুনে টেলর বেজায় হাসলেন। 'একটা বুড়ো গোসাপ ঐ পাহাড়ে থাকে জানি, কিন্তু সে যে দেবতা জানতাম না।' তিনি গোরোর ওপর চটে উঠলেন, 'ব্যাটারা বড্ড বাজে বকে। এখন বুঝুন ঠেলা! ঠিক আছে, আমি আজই লোক পাঠাচ্ছি কাছের গ্রামে। তবে ভয় হয়, সংস্কার বড় মারাত্মক জিনিস। ওখানে কাজ করতে কেউ রাজী হবে কি না জানি না। যা হোক, আমি সব রকম চেষ্টাই করে দেখব।'

টেলর কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'আমি কাল ছিলাম না। অতিথি সৎকার করতে পারলাম না। তা আমি নেই খবরটা দিল কে?'

'এক বৃদ্ধ।' বিল জানালেন।

'আলাপ হলো তার সঙ্গে?'

'আলাপ?' বিল আঁতকে ওঠেন। 'বাপ্‌রে কি মেজাজ! বলল—নেই। শিগগিরি ফিরবে। ব্যস্! মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল। দুটো বেশি প্রশ্ন করলে মেরেই বসত!'

টেলর লজ্জিতভাবে বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, কি কাণ্ড।'

মাগাবাবু এবার প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, বৃদ্ধটির নাম কি ফিলিপ কার্লো?'

টেলর অবাক। 'আপনি চেনেন কার্লোকে? আলাপ আছে?'

'না। একবার মাত্র দেখেছিলাম। অনেক দিন আগে। উনি কি আপনার সঙ্গে কাজ করছেন?'

'হুঁ, কাজ করছেন বটে, কিন্তু তাতে লাভ না হয়ে বরং আমার ক্ষতিই হচ্ছে।'

'কেন? অমন পণ্ডিত লোক।'

'তা ঠিক। কিন্তু ডঃ কার্লো এখন রুগ্ন। ওঁর শরীর মন কোনোটাই সুস্থ নয়। দেখলেন তো, আপনাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করলেন!'

'ব্যাপারটা কি?'

'ব্যাপার খুবই দুঃখজনক। এত বড় প্রতিভার ওই পরিণতি হবে ভাবিনি।' টেলর বিষণ্ণভাবে একটু চুপ করে থেকে বলতে শুরু করলেন, 'প্রায় আড়াই বছর আগে ডঃ কার্লোর সঙ্গে আমার আলাপ হয় এক উপজাতি গ্রামে। বিষাক্ত পোকার কামড়ে আদিবাসীরা কি কি টোটকা ব্যবহার করে তিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করছিলেন। কয়েকদিন পর আমি সে গ্রাম ছেড়ে চলে যাই। মাত্র তিন দিন পরে ঐ গ্রামের একজন এসে আমায় খবর দিল কার্লোর গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটেছে। কি ভাবে তাঁর কুটিরে আগুন লাগে। জ্বলন্ত পোশাকে উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় দৌড়ে পালাতে গিয়ে তিনি এক খাদের মধ্যে পড়ে যান। পায়ে আঘাত লাগে। গ্রামের লোক তাঁকে তিরিশ মাইল দূরে এক মিশনারি হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

'তাড়াতাড়ি হাসপাতালে গেলাম। কার্লো মাস দুই ভুগে সুস্থ হলেন, কিন্তু একটা পা জখম হয়ে গেল। তাছাড়া মুখটা পুড়ে গিয়ে বিকৃত হয়ে গেল। আমি অনুরোধ করলাম—ফিরে যান।

কিন্তু কার্লো রাজী হলেন না। উনি জেদ ধরলেন আমার সঙ্গে যাবেন। আমি একটু সাহায্য করলে এখানে রিসার্চ চালাতে পারবেন।

'বাধ্য হয়ে সঙ্গে নিয়ে এলাম। লেবরেটরীতে এনে রাখলাম। দুঃখের বিষয়, কিছুদিন পরে বুঝলাম কার্লো ভীষণ মানসিক শক্ পেয়েছেন। কোন কঠিন গবেষণা ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। দিনের পর দিন গুম হয়ে থাকেন। কারো সামনে বেরতে চান না। রাতে ঘুম হয় না। অকারণে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।'

'ওঁকে ডাক্তার দেখালেন না কেন?' মামাবাবু বললেন।

'চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই ডাক্তারের কাছে যেতে রাজী হলেন না। মনে হয়, ধারণা হয়েছিল, ওঁকে পাগলা গারদে রাখা হবে।'

'কোন আত্মীয়কে যদি খবর দিতেন।'

'তেমন কারও ঠিকানা পেলাম না। ডারবান থেকে ওঁর পরিচিত এক ভদ্রলোককে ডেকে এনেছিলাম, কার্লো তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। জোর করতে সাহস হলো না। যদি স্ট্রোক হয়ে যায়! ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। এত বড় ব্রেন, সত্যি কি পাগল হয়ে যাবে? তাই আমার কাজের মধ্যে ওঁকে ডাকতে লাগলাম। আমার গবেষণা নিয়ে আলোচনা করতাম। একটু একটু করে দেখি উনি ফেরোমন সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তখন ভালই লেগেছিল। যদি এত বড় পণ্ডিতের সাহায্য পাই! আমিই প্রস্তাব দিই, আসুন আমরা একসঙ্গে কাজ করি। পরে বুঝলাম, নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছি। কার্লো ফেরোমন নিয়ে মেতে গেলেন এবং লেবরেটরী অধিকার করে বসলেন। আমাকে একা কিছুতেই কাজ করতে দেবেন না। সব সময় আমার ওপর সর্দারি করবেন। কার্লোকে পেয়ে আমার কোন উপকার হলো না। কারণ, কোন সমস্যা নিয়ে টানা কাজ করার মত শরীর বা মনের অবস্থা উনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। বিষয়টাও

ওঁর কাছে নতুন। শুধু নানারকম উদ্ভট কল্পনা করেন আর আমাকে তাঁর কল্পনামাফিক কাজ করতে বলেন। আজ বছর খানেকের ওপর এই অবস্থা চলছে। আমার কাজের খুব ক্ষতি হচ্ছে। যতটা পারি ওঁকে লুকিয়ে কাজ করি। উনি উপস্থিত থাকলে বড় ডিসটার্বেন্স হয়। মহা সমস্যায় পড়েছি। কি যে করি—'

টেলর মাথায় হাত দিয়ে হতাশ ভাবে বসে রইলেন। সত্যি, এত নামী বৈজ্ঞানিকের এই শোচনীর পরিণতি ভাবতে কষ্ট হয়।

মামাবাবু বললেন, 'যদি অনুমতি করেন তো ডঃ কার্লোর সঙ্গে আমি একবার আলাপ করব। চেষ্টা করব ওঁকে শহরে ভাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে।'

'খুব ভাল কথা। যদি পারেন তো মহা উপকার হয়। আমার অবস্থাটা তো বুঝছেন। তবে দয়া করে ওঁর কাছে ফেরোমন প্রসঙ্গ তুলবেন না।'

'কেন ?'

'কারণ, এটা হলো টপ্ সীক্রেট, মানে কার্লোর ভাষায়। উনি স্থির করেছেন, ফেরোমন নিয়ে কয়েকটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করবেন। কিন্তু যতদিন না রিসার্চ কমপ্লিট হয়, আমায় বারণ করেছেন যেন এ-বিষয়ে কেউ জানতে না পারে। তাহলেই নাকি অন্য বৈজ্ঞানিকরা এই লাইনে রিসার্চ শুরু করে দেবে। হয়তো আমাদের গবেষণার সূত্র চুরি করার ষড়যন্ত্র হবে।'

'কিন্তু জুওলজি পত্রিকায় যে আপনি পেপার পাবলিশ করেছেন ?' সুনন্দ একটু মজা করে।

'লুকিয়ে। জানতে পারলে বৃদ্ধ কেলেংকারী করবে। আচ্ছা বলুন তো প্রোফেসর, আমার এত দিনের সাধনা কি ওঁর খামখেয়ালীপনার জন্য বৃথা যাবে ? এতটা আত্মত্যাগ কি সম্ভব ? কেন আমি আমার গবেষণার ফল প্রকাশ করব না ? কেন আমি আমার একান্ত নিজস্ব পরিশ্রমলব্ধ গবেষণায় অন্যকে ভাগ বসাতে দেব ? আমার লেখায় অন্যের নাম যুক্ত করব ?'

মামাবাবু সায় দিলেন, 'আপনি ঠিকই বলছেন। আপনার কোন অন্যায় হয়নি। আপনি যথেষ্ট করছেন। কিন্তু এভাবে চললে তো আপনাদের দু'জনেরই ক্ষতি। আমি একবার চেষ্টা করবই। আপনি কার্লোর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন ?'

'নিশ্চয় ! তবে সুযোগ বুঝে, যেদিন ওঁর মন বেশ শান্ত থাকবে।'

টেলর বিদায় নিলেন। আমরা কি ভাবে টেলরকে কার্লোর কবল থেকে উদ্ধার করা যায় তাই নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিলাম। মামাবাবু বারবার বলতে লাগলেন, 'এত বড় বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া কক্ষনো উচিত নয়। চেষ্টা করতেই হবে ওঁকে ভাল করে তোলার।'

পরদিন সকালে মামাবাবু, সুনন্দ ও আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। লেবরেটরীর কাছে টেলরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। টেলর বললেন, 'প্রভাতে বায়ুসেবন ও কিঞ্চিৎ পদচারণ আমার অভ্যাস। চলুন ভিতরে।'

'কার্লো ?' আমি সভয়ে প্রশ্ন করি।

'ঘুমোচ্ছেন। ঘুম আসছিল না, তাই মাঝরাতে ঘুমের বড়ি খেয়েছেন। চলুন লেবরেটরী দেখাব।'

লেবরেটরীতে ঢুকে আমরা অবাক। শহর থেকে এতদূরে, গহনে এমন আধুনিক যন্ত্রপাতি সুসজ্জিত গবেষণাগার দেখব কল্পনা করিনি। মামাবাবু বললেন, 'আপনার কি মশায় জীন বা দৈত্য হাতে আছে। এ-সব আনালেন কি করে ?'

'দৈত্য নয়। উপজাতিদের সঙ্গে ভাব আছে। তারাই দরকার মত বয়ে এনে দেয়।'

দেখলাম ইলেকট্রিসিটিও রয়েছে। টেলর বললেন, 'জেনারেটর বসিয়েছি। আফ্রিকার নানা জায়গার আমার আরোও কয়েকটা লেবরেটরী আছে। তবে এটাই সেরা। নির্জনে কাজ করতে

আমার ভাল লাগে।'

মামাবাবু ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। কতগুলো লেবেল আঁটা শিশি দেখিয়ে বললেন, 'এগুলোর মধ্যে কি ফেরোমন আছে?'

'হ্যাঁ। কৃত্রিম উপায়ে বানিয়েছি।'

টেলর জাম্বোকে ডেকে কফি বানাতে বললেন। বিদায় নেবার সময় আশ্বাস দিলেন, 'আশা করছি আপনাদের পোর্টারের খবর শিগগিরি পাবেন।'

রাত্রে আন্তোনিও জানাল, 'প্রোফেসর ঘোষ, আজ পাগলা বৈজ্ঞানিককে দেখলাম।'

'কে, কার্লো?'

'হ্যাঁ! পাঁচিলের বাইরে একটা পাথরের ওপর বসেছিলেন। আমায় দেখেই চট করে ভিতরে ঢুকে গেলেন। জানেন, ওঁকে আমি আগে দেখেছি।'

'কোথায়?'

'লিবিয়ায়। চার বছর আগে। সাহারার প্রান্তে এক মরুদ্যানে। আলাপ হয়নি। দূর থেকে দেখেছিলাম। সেদিনও ঐ এক ভঙ্গিতে বসেছিলেন। বেদুইন শেখরা বলেছিলেন—সাহেব বেশ কিছুদিন ঐ মরুদ্যানে আছে। পোকামাকড় নিয়ে কি সব পরীক্ষা করে। বেজায় রাগী।'

'আর কোন শ্বেতাঙ্গ ছিল সেখানে?'

'না। তখন অবশ্য কার্লোর গালে পোড়া দাগ ছিল না। তবে আমার ফটোগ্রাফারের চোখ ঠিক চিনেছে।'

॥ ৭ ॥

টেলর সেদিন এলেন না। পরদিন সকাল আটটা নাগাদ দেখা করতে এলেন। বললেন, 'কয়েকজন পোর্টার যোগাড় হয়েছে, কিন্তু মুস্কিল হলো, তারাও পাহাড়ের কাছে পাথর কাটতে রাজী

হচ্ছে না। আপাততঃ না হয় এদের নিয়ে রকপেন্টিং-এর খোঁজে বেরিয়ে পড়ুন! ফসিল উদ্ধার পরে করবেন।'

মামাবাবু চিন্তা করতে থাকেন।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে আন্তোনিও হাজির হলো। কোন কাক-ভোরে সে ক্যামেরা ঘাড়ে বেরিয়েছিল। এসেই বলল, 'চা খাব। ওঃ, আজ ছুটো জব্বর সাবজেক্ট পেয়েছি।'

'কি সাবজেক্ট?'

'এক নম্বর, একপাল বুনো কুকুর। কি গ্রেসফুল! একটা প্রকাণ্ড জেব্রার পিছনে তাড়া করে ছুটছিল। অনেক ছবি নিয়েছি।'

বিল তাড়াতাড়ি বললেন, 'আন্তোনিও, এমন কর্ম কক্ষনো করবেন না। বুনো কুকুর আফ্রিকার সবচেয়ে হিংস্র জীব। অকারণে শিকার করে। বাগে পেলে মানুষকেও ছাড়ে না।'

তাঁর কথায় কান না দিয়ে আন্তোনিও বলল, 'ছু' নম্বর হলো পিঁপড়ে। লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে একটা গাছে বাসা বেঁধেছে। গাছের অর্ধেকটা পর্যন্ত থিকথিক করছে, পিঁপড়েতে গুঁড়ি ও ডালগুলো ঢেকে গেছে। মাইলখানেক দূরে ঐ বনের মধ্যে। হ্যাঁ, একটা ওয়াটার-হোল আবিষ্কার করেছি; বিল, যাবেন? ছু'জনে পাশে লুকিয়ে থাকব। জন্তুদের জল খাবার ছবি তুলব। রাতেও থাকব, দেখব। উঁহু, আর কেউ নয়। ভিড় হলে জন্তুরা আসবে না। বিল, যাবেন?'

'যাব', বিল সম্মতি জানালো।

আন্তোনিও হুড়হুড় করে কথা বলে যাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে টেলরের দিকে চাইল, 'মশাইকে তো আগে দেখিনি!'

তাকে টেলরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

'ও, আপনাকে চিনি। মানে নাম শুনেছি, দারুণ বৈজ্ঞানিক। আপনিই তো আমাদের পোর্টার যোগাড় করে দেবেন?'

টেলর বলল, 'চেষ্টা করছি। আপনার পেতে অসুবিধা হবে না। প্রোফেসরের জন্যই ভাবনা। হ্যাঁ, প্রোফেসর, ভেবে দেখলাম

আপনার ওই জায়গাটা অনুসন্ধান না করে চলে যাওয়া উচিত হবে না। আমি অন্য গ্রামে চেষ্টা করি। ক'টা দিন ধৈর্য ধরুন। কোথাও যাবেন না। এখানেই থাকবেন। আচ্ছা বিদায়।'

দুপুর একটা নাগাদ টেলর গোরোকে নিয়ে আবার হাজির হলেন। সঙ্গে তাঁবু ও কিছু জিনিস। বললেন, 'এক জায়গায় রকপেন্টিং-এর সন্ধান পেয়েছি। লাঞ্চ হয়ে গেছে তো? তবে যান, দেখে আসুন। গোরো আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। মাত্র দু' মাইল পথ। সন্ধ্যের আগে ফিরে আসতে পারবেন।'

'বেশ যাচ্ছি। কিন্তু তাঁবু নিয়ে বেরিয়েছেন যে?'

'আজ ঝর্ণার কাছে কাটাব। লেবরেটরীতে ফিরছি না। কার্লোর মেজাজ অত্যধিক খারাপ। আমার সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। কি করব, মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতি হয়। যাহোক, এখন ওর সামনে না যাওয়াই শ্রেয়। কাল সকালে ওর মেজাজ ঠাণ্ডা হলে ফিরব। বনের মধ্যে একটা মস্ত মৌচাক আছে। বসে বসে মৌমাছি দেখি। আপনারা ফিরে এলে গল্প হবে।'

দুই নয়, অন্ততঃ চারমাইল হাঁটতে হলো। চৌকো বড় একটা পাথরের গায়ে লাল-কালো রেখায় কয়েকটা জিরাফ ও হরিণ আঁকা। একটা কাগতাড়ুয়া গোছের মানুষের ছবি। দেখলে মনে হয় ছোট ছেলে এঁকেছে।

মামাবাবু একটু পরীক্ষা করেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'বাজে খাটলাম। চল ফিরি।'

একটু জিরিয়ে ফিরতি পথে হণ্টন দিলাম।

টেলর আমাদের তাঁবুর কাছে অপেক্ষা করছিলেন।

বললেন, 'কেমন দেখলেন?'

'ঠকেছি, এগুলো তেমন প্রাচীন নয়।' মামাবাবু জানালেন।

'ইস্, লোকটা দেখছি বাজে খবর দিল।' টেলর কাঁচুমাচু ভাবে বললেন। টেলর তাঁর তাঁবুতে আমাদের কফি খেয়ে যেতে ডাকলেন। কিন্তু মামাবাবু আর গেলেন না। বড্ড ক্লান্ত।

আন্তোনিও একটা বাঁদরছানা ধরেছিল। তাঁবুর খুঁটিতে সেটা বাঁধা থাকত। আবিষ্কার করলাম সেটা ইতিমধ্যে পালিয়েছে।

॥ ৮ ॥

অঘোরে ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ শুনলাম মামাবাবুর কণ্ঠস্বর। 'সুনন্দ, অসিত। ওঠ, ওঠ।'

ধড়মড় করে উঠে বসলাম—'কি ব্যাপার?'

'কেমন শব্দ হচ্ছে শুনতে পাচ্ছ?' মামাবাবু বললেন।

গভীর রাত। বাইরে হালকা চাঁদের আলো, অগ্নিকুণ্ডের কাঠগুলো নিবু-নিবু। তাঁবুর পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালাম। কান পাতলাম। হ্যাঁ, কতগুলো অস্বাভাবিক শব্দ। খড়-খড়, মড়-মড়। বনের ভিতর কারা যেন ছোটাছুটি করছে। মাঝে মাঝে ভীত বাঁদরের কিচিমিচি। পাখির ডাক। শব্দগুলো যেন ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। কে বা কারা আসছে? কোন জানোয়ার? রহস্যময় আফ্রিকায় এ কোন অজ্ঞাত বিপদের পদধ্বনি? বন্দুক এগিয়ে রাখি। বিল নেই তাই অসহায় লাগছিল।

অগ্নিকুণ্ডের ক্ষীণ আলোয় দেখলাম, কয়েকটা মেঠো ইঁদুর লাফাতে লাফাতে পালাল। সঙ্গে সঙ্গে দুটো শেয়াল ও পরেই একটা হায়না দ্রুত তাঁবুর গা ঘেঁষে ছুটে গেল। এরা ভয় পেয়েছে। কিন্তু কেন?

মামাবাবু নিশ্চল। সর্ব ইন্দ্রিয় উন্মুখ। একদৃষ্টে বনের দিকে চেয়ে আছেন। সহসা তিনি টর্চ জ্বাললেন। কয়েক মুহূর্ত টর্চের জোরালো আলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হলো। তারপরই তিনি সভয়ে বললেন, 'ওই দেখো!'

দেখলাম, অদূরে বনের প্রান্তে মাটির ওপর একটা চওড়া কালো দাগ। ও কি, দাগটা যে সচল! যেন প্রকাণ্ড এক আলকাতরার স্রোত বনের মধ্য থেকে বেরিয়ে ধীরে গড়িয়ে আসছে। স্রোতের মুখ অন্ততঃ দশ গজ চওড়া, বস্তুটি যে কি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলাম না।

মামাবাবু উত্তেজিতভাবে দ্রুত বলতে লাগলেন—'আমি-এণ্ট। বুঝতে পারছ না? লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি পিঁপড়ের বাহিনী। ঠিক সৈন্যবাহিনীর মতো সারিবদ্ধভাবে মার্চ করে চলে। হিংস্র মাংসাশী ক্ষুধার্ত এই পিঁপড়েদের খপ্পরে পড়লে দুনিয়ার ছোট বড় কোন প্রাণীর নিস্তার নেই। সামনে যাকে পায় আক্রমণ করে। প্রাণভয়ে তাই সবাই পালায়। মনে হয়, আন্তোনিও এই বাহিনীটাকেই গাছের গায়ে বিশ্রাম নিতে দেখেছিল। কিন্তু এরা এদিকে এল কেন? আশ্চর্য। এরা বনের ছায়া বা বড় ঘাসবনের মধ্য দিয়ে চলে। উন্মুক্ত প্রান্তর, শুকনো মাটি, পাথরের ওপর দিয়ে চলে না। দেখ দেখ, পিঁপড়ের ঝাঁক সোজা তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছে। চল পালাই, সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত!'

তাঁবু ছেড়ে বেরব, হঠাৎ মামাবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'সুনন্দ, বাঁদর বাচ্চাটা কি দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে?'

'না, দড়ি খুলে। অত শক্ত গেরো কি করে যে খুলল!'

'হুম্! চল। বিলের পিস্তলটা সঙ্গে নাও!' মামাবাবু অন্ধকারে চলতে শুরু করলেন। একবার জিজ্ঞেস করলাম— 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'টেলরের তাঁবুতে। কথা বোলো না।'

নিঃশব্দে আমরা টেলরের তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়ালাম। দেখি অত রাতেও টেলর জেগে। তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। মামাবাবু যে কাণ্ড করলেন তাতে আমরা তো স্তম্ভিত। টেলরের পিছনে গিয়ে বন্দুক তাক করে বলে উঠলেন, 'কি শুনছেন মিস্টার টেলর?'

টেলর বিদ্যুৎবেগে ফিরে দাঁড়াতেই মামাবাবু বললেন, 'উঁহু, এগোবেন না, তাহলে গুলি করতে বাধ্য হব। সুনন্দ, তুমি একে পিস্তল নিয়ে পাহারা দাও। নড়লেই গুলি করবে। অসিত, খেয়াল রেখো—গোরো আছে কি না। আমি আসছি—'

টেলর রাগে অগ্নিশর্মা। চিৎকার করে উঠলেন, 'আপনার

মাথা খারাপ হয়ে গেছে প্রোফেসর ঘোষ!' মামাবাবু ভ্রূক্ষেপ না করে টেলরের তাঁবুর ভিতর ঢুকলেন।

একটুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলেন। হাতে একটা বড় শিশি। 'মিস্টার টেলর, আর্মি-এন্ট-এর ফেরোমন-এর শিশি এখানে কেন? আর শিশিটা খালি কেন?'

'তার জন্যে কি আপনাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে? আমাকে যেতে দিন।' টেলর অপমানে ফুলছে।

'যাদের পিঁপড়ে লেলিয়ে দিয়ে মারবার চেষ্টা করেছিলেন, তারা কৈফিয়ৎ দাবি করতে পারে বৈকি!'

'কি যা-তা বলছেন!'

'ঠিকই বলছি। বোগাস্ রকপেন্টিং দেখেই বুঝলাম আপনার কোন মতলব আছে। তাঁবু থেকে কিছুক্ষণ আমাদের সরিয়ে রাখলেন। কোন ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের আভাস পেলাম। তাই সতর্ক ছিলাম। যাক্, আপনি এখন আমাদের বন্দী। ষড়যন্ত্রের কারণ কাল অনুসন্ধান করব। সুনন্দ ওর হাত বাঁধ!'

টেলর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মামাবাবুকে দেখতে লাগলেন! কোন কথা বললেন না।

বন্দী টেলর সমেত আমরা আমাদের তাঁবুর কাছে আশ্রয় নিলাম। টর্চের আলোয় দেখলাম, তাঁবু এবং তার চারপাশে থিক-থিক করছে পিঁপড়ে। যেন কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে জায়গাটা।

মামাবাবুর নির্দেশে টেলরের পা-ও বাঁধলাম। বলা যায় না। যদি দৌড়ে পালায়। তারপর ভোর হওয়ার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

পুবের আকাশ সামান্য ফরসা হবার সঙ্গে সঙ্গে পাখ-পাখালির কলতান শুরু হলো। ঠিক তখুনি কানে এলো আন্তোনিওর শিশ। মেজাজে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে আসছে। চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'আন্তোনিও, মিঃ হার্ডি, আমরা এখানে।'

আমাদের ঐ অবস্থায় দেখে বিল অবাক। 'কি ব্যাপার, টেলরকে বেঁধে রেখেছেন কেন?'

'কারণ উনি আমাদের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন!'

'কিভাবে?'

'পিঁপড়ে লেলিয়ে দিয়ে।'

'এ্যাঁ, পিঁপড়ে লেলিয়ে দিয়ে! লোকটা যাত্নবিদ্যা জানে নাকি?' বিস্ময়ে বিলের চোখ গোল হয়ে ওঠে। আন্তোনিও মাথা নেড়ে বলল, 'হুঁ, উইচ-ক্রাফট্। আমি শুনেছি উপজাতীয় ওঝারা মন্ত্রের সাহায্যে সিংহ লেলিয়ে দিতে পারে।'
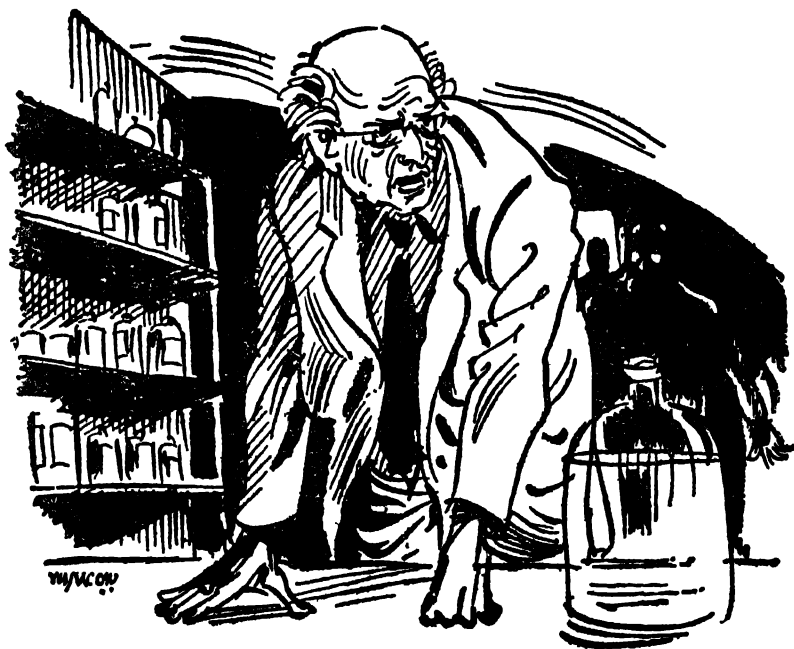
'না, যাত্ন নয়। অতি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক কৌশল। এই শিশিটা দেখছেন, এর মধ্যে ফেরোমন ছিল। কৃত্রিম উপায়ে তৈরি। শিশির গায়ে লেখা রয়েছে আর্মি-এন্ট। তার নিচে লেখা দেখুন— Trail Substance। আর্মি-এন্ট অন্ধ। প্রত্যেক পিঁপড়ে চলার সময় পিছনের দিকের একটি শুঁড়ের সাহায্যে মাটিতে এরকম

ফেরোমন লাগাতে লাগাতে যায়। এই ফেরোমন-এর নাম Trail Substance। সেই ফেরোমন-এর গন্ধ শুঁকে পিছনের পিঁপড়ে সামনের পিঁপড়েকে অনুসরণ করে দলবদ্ধভাবে এগোয়। আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে টেলর আন্তোনিওর দেখা আর্মি-এন্ট-এর আস্তানা থেকে আমাদের তাঁবু অবধি এই ফেরোমন ছড়িয়ে রেখেছিল। রাতে পিঁপড়ের ঝাঁক চলতে শুরু করে গন্ধ অনুসরণ করে আমাদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসে।'

'উঃ, খুব বেঁচে গেছেন। টের পেলেন কি করে! ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল বুঝি?' বিল বললেন।

'আমি জেগেছিলাম। সুনন্দ, অসিত ঘুমচ্ছিল। নানা কারণে টেলরের ওপর আমার সন্দেহ দানা বাঁধছিল। আজ রক-পেন্টিং দেখেই বুঝলাম, হয়তো আজই বিপদ আসবে।'

'কেন, রক-পেন্টিংয়ে কি ছিল?'

'বাজে ছবি। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আঁকা। হয়তো টেলরের নিজস্ব শিল্পচর্চা। বুঝলাম, আমাদের কায়দা করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘুম আসছিল না। মন কোনো বিপদের আশংকা করছিল। তবে আক্রমণ যে এমন বিচিত্র উপায়ে হবে তা অবশ্য আন্দাজ করতে পারিনি! টেলর আঁটঘাঁট বেঁধেই কাজে নেমে-ছিলেন। বাঁদরটাকে অবধি ছেড়ে দিয়েছিলেন, পাছে সে চিৎকার করে আমাদের জাগিয়ে দেয়। আমার আর একটা সন্দেহ হয়, আমাদের খাবার জলে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিলেন টেলর। খুব সম্ভব ঘুমের ওষুধ। টেলর, সত্যি করে বলুন তো কি করেছিলেন?'

টেলর কোনো উত্তর দিল না।

মামাবাবু বললেন, 'রক-পেন্টিং দেখতে বেরবার আগে আমি তাঁবুর জিনিসপত্র ভাল করে পরীক্ষা করে যাই। ফিরে এসে তাঁবুতে ঢুকে লক্ষ্য করে দেখলাম মাটিতে বসানো খাবার জলের জগটা যেন একটু সরানো হয়েছে। জলের রঙও কেমন সামান্য ঘোলা। কোনো রিস্ক না নিয়ে জলটা ফেলে দিই।'

'অর্থাৎ ওই জল খেলে ?' আমি সভয়ে বলে উঠি।

'হ্যাঁ, আমাদের ঘুম আর কোনো দিনও ভাঙত না।'

'আমার ইচ্ছে হচ্ছে শয়তানটাকে এক্ষুনি গুলি করে মারি।' বিলের ক্রুদ্ধ গর্জনে টেলর যেন শিউরে উঠল। 'কিন্তু প্রোফেসর, একটা রহস্য বুঝতে পারছি না। আপনাদের হত্যা করে ওর লাভ কি ?' বিল প্রশ্ন করলেন।

'সেটা বোধহয় ডঃ কার্লোর সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারব। সুনন্দ, আন্তোনিও, তোমরা টেলরকে পাহারা দাও। বিল, অসিত আমার সঙ্গে এস।'

গেট বন্ধ ছিল। পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে ঘরের দরজায় করাঘাত করলাম। গোরো কবাট খুলে দিল। তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। বিল গোরোকে কঠোর গলায় বললেন, 'চালাকির চেষ্টা করলেই গুলি খাবে।' বিল তাকে একটা খালি ঘরে পুরে শিকল লাগিয়ে দিলেন। তারপর কার্লোর খোঁজে আমরা লেবরেটরী ঘরে হাজির হলাম।

॥ ৯ ॥

কার্লো একটা চেয়ারে বসে চিন্তামগ্ন ছিলেন। আমাদের দেখে চমকে উঠলেন।—'একি, রিপোর্টার! তোমরা এখানে কেন ? না, ফেরোমন রিসার্চ সম্বন্ধে আমি এখন একটি কথাও বলব না। কাজ শেষ না হলে কাউকে কিছু জানাব না।' কার্লো প্রায় মারতে আসেন আর কি।

মামাবাবু শান্ত গলায় বললেন, 'আমরা রিপোর্টার, কে বলেছে ?'

'কেন, টেলর।'

টেলর আপনাকে ভুল বুঝিয়েছে। আমি একজন প্রাণি-বিজ্ঞানী। আপনার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করি। আমি জানতে এসেছি, ফেরোমন নিয়ে কে গবেষণা করছে ? আপনি, না টেলর ?

না, দু'জনে একসঙ্গে ?'

'ফুঃ! টেলর ফেরোমন-এর কি বোঝে? কোনো মৌলিক গবেষণা করার মত ওর মাথা নেই।'

'কিন্তু জুওলজি পত্রিকায় টেলর নিজের নামে ফেরোমন-এর ওপর দুটি প্রবন্ধ লিখেছে। আমি নিজে পড়েছি। একেবারে মৌলিক গবেষণা। প্রথমটা পঙ্গপালের বংশবৃদ্ধিতে ফেরোমন-এর প্রভাব। দ্বিতীয়টি কৃত্রিম ফেরোমন তৈরি সম্বন্ধে।'

কার্লোর দৃষ্টি বিস্ফারিত। 'সর্বনাশ! তার মানে সে আমার লেখা চুরি করেছে। গবেষণা সংক্রান্ত আরও অনেক মূল্যবান পেপারস্ এক সঙ্গে ছিল। ওর কাজ ছিল আমার লেখা টাইপ করে এখানে গুছিয়ে রাখা। উঃ কি বিশ্বাসঘাতক, কি শয়তান! কোথায় সে—?'

কার্লোর চেহারা ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত।

'আচ্ছা, টেলরের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয় কি ভাবে?' মামাবাবু প্রশ্ন করলেন।

কার্লো কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর বললেন—

'প্রথম পরিচয় এক উপজাতি গ্রামে। তারপর এক্সিডেন্ট হয়ে হাসপাতালে থাকার সময় ও আমায় দেখতে আসে। সেবা-যত্ন করে। হাসপাতাল থেকে বেরোবার পর টেলরই আমাকে এই নির্জন লেবরেটরী বানিয়ে কাজ করার পরামর্শ দেয়। দুর্ঘটনায় আমার মুখ বিকৃত হয়ে গেছিল। লোকে হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকত। ফলে লোকজনের ভিড় আমার কাছে তখন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তার প্রস্তাব তাই সানন্দে গ্রহণ করি। ও আমাকে নিজের পয়সা খরচ করে লেবরেটরী বানিয়ে দিয়েছিল। দরকার মত নানা জায়গায় সঙ্গে করে নিয়ে যেত।'

'টেলর আফ্রিকায় কি করছিল?' বিল জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক জানি না। বলেছিল, ও একজন প্রাণিবিজ্ঞানী। বিভিন্ন

প্রজাতির পিঁপড়ের তালিকা তৈরি করছে। খুব ভদ্র ছিল। কৃতজ্ঞতাবশে ভেবেছিলাম আমার আবিষ্কারে ওর নামটাও জুড়ে দেব। ভাবতে পারিনি আমায় ঠকাবে। আমার এতদিনের সাধনা চুরি করবে! ওঃ।'

'মনকে শক্ত করুন ডঃ কার্লো। আপনার কাগজপত্র আশা করছি উদ্ধার করতে পারব। মনে হয় ও অপেক্ষায় ছিল আপনার গবেষণা শেষ হলে, আপনাকে চিরতরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে সমস্ত গবেষণা নিজের নামে প্রকাশ করে বিখ্যাত হবে। কেউ টের পেত না তার জোচ্চুরি। দৈবাৎ আমি আপনাকে চিনে ফেলাতে তার প্ল্যান ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হলো। তখন আমাদের খতম করার পরিকল্পনা করল।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ, আপনারই তৈরি কৃত্রিম ফেরোমন-এর সাহায্যে! আচ্ছা ডঃ কার্লো, কয়েকদিন আগে টেলর এক ছোট পাহাড়ের কাছে তাঁবু ফেলেছিল। সেখানে কি আপনিও ছিলেন? আপনার জুতোর ছাপ যেন আমি লক্ষ্য করেছি।' বিল কার্লোর জুতোর দিকে চেয়ে বললেন।

'হ্যাঁ, ছিলাম। আমি আগে চলে আসি। টেলর পরে এল।'

'ওখানে কি করছিলেন?' মামাবাবু প্রশ্ন করলেন।

'আমি ঐ পাহাড়ের গুহায় কিছু আদিম মানবের পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র দেখতে পাই। টেলরকেও দেখিয়েছিলাম। জিনিসগুলো পরীক্ষা করছিলাম। হঠাৎ টেলর বলল, বৃষ্টি নামবে। আপনি এখুনি ফিরে যান, আমি কয়েকদিন পরে যাচ্ছি।'

'হুঁম। ঠিক আছে। আপনি বিশ্রাম করুন, উত্তেজিত হবেন না। আমরা চললাম।'

'আমার পেপার্স?' কার্লো আর্তনাদ করে উঠলেন।

'দেখি, কি করতে পারি।'

বাইরে এসে মামাবাবু বললেন, 'টেলরের ওপর আমার প্রথম

সন্দেহ জাগে কখন জান? আস্তোনিওর কথা শুনে।'

'কি কথা?'

'সেই যে আস্তোনিও বলল, লিবিয়ায় এক মরুদ্যানে সে কার্লোকে দেখেছিল। একা। অথচ টেলরের প্রবন্ধে ছিল সে ঠিক ঐ সময়ে এবং ঐ জায়গায় পঙ্গপাল নিয়ে রিসার্চ করে। ফলে আমার ধোঁকা লাগল—কে গবেষণা করছিল? টেলর না কার্লো? টেলর কি তবে কার্লোর কাজ চুরি করেছেন? আমার অনুমান দেখলাম সঠিক।'

বন্দী গোরোর ঘরের শিকল খুলে মামাবাবু ভিতরে ঢুকলেন। গোরো মাটিতে বসে ছিল। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। মামাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'আমাদের পোর্টারদের দেবতার গল্প বলে ভয় দেখাতে কে তোমায় নির্দেশ দিয়েছিল? সত্যি বলবে।'

'টেলর সাহেব, বানা।'

মামাবাবু আর কথা না বলে শিকল তুলে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। 'টেলর কেন এখানে আমাদের কাজ বন্ধ করতে চেয়েছিল বুঝতে পারছো?'

'হ্যাঁ। পাছে আমরা ওই গুহার সন্ধান পাই।'

'অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।' মামাবাবু মন্তব্য করলেন।

॥ ১০ ॥

মামাবাবু টেলরকে প্রশ্ন করলেন। 'কার্লোর পেপার্স কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?'

'আমি লুকোইনি।' টেলরের মিষ্ট ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়েছে। চোখে ক্রূর হিংস্র দৃষ্টি।

'ও, ভালো কথায় কাজ হবে না। বেশ, আপনার দাওয়াই আপনার ওপর প্রয়োগ করব। দেখি, কথা বেরোয় কিনা। সুনন্দ, অসিত, টেলরকে ঐ গাছটার সঙ্গে বাঁধ।'

ফেরোমন-এর শিশিতে সামান্য তলানি পড়েছিল। মামাবাবু

তাতে খানিক জল মেশালেন। তারপর আমাদের তাঁবুর কাছে গেলেন।

তখন তাঁবুতে খোলা খাবার এক টুকরোও অবশিষ্ট ছিল না। বিল একটা হরিণ মেরে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল। শুধু কংকালটা ঝুলছে। তাঁবুর কাপড়টা অবধি কেটে কুটি কুটি করেছে ক্ষুধার্ত পিপীলিকারা।

মামাবাবু সাবধানে তাঁবুর কাছে গিয়ে পিপীলিকা ব্যূহের গা থেকে ফেরোমন ঢালতে ঢালতে পিছিয়ে এলেন। থামলেন টেলরের সামনে। তারপর সরে আমাদের কাছে এসে বললেন, 'দেখা যাক।'

গভীর আগ্রহে লক্ষ্য করি। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম কয়েকটা পিঁপড়ে ফেরোমন-এর গন্ধ শুঁকে শুঁকে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। দেখতে দেখতে চারদিক থেকে দলে দলে পিঁপড়ে ছুটে এসে তাদের অনুসরণ করতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যে এক বিশাল বাহিনী ফেরোমনের গন্ধ বেয়ে সড়সড় করে এগিয়ে চলল। আন্তোনিও চট করে তার ক্যামেরা বাগিয়ে ধরল।

মামাবাবু বেশ দার্শনিকভাবে বলতে লাগলেন—'বুঝলে অসিত, আর্মি-এন্ট হলো যাযাবর। কেবল দল বেঁধে ঘোরে। দিনের বেলায় গাছ বা পাথরের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়, রাতে পথ চলে। এদের আর এক নাম ড্রাইভার এন্ট।'

'আঁ-আঁ!' চমকে উঠে দেখি টেলর প্রাণপণে বাঁধন ছেঁড়বার চেষ্টা করছেন। তার বিস্ফারিত দৃষ্টি আগুয়ান পিঁপড়ে বাহিনীর ওপর নিবদ্ধ।

মামাবাবু বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বললেন, 'আর্মি-এন্ট-এর এই প্রজাতির নাম ডরিলাস। এদের সাউথ আমেরিকান জাতি-ভাইদের নাম হল একিটন। এদের সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে।'

'আমায় ছেড়ে দাও! আমি বলছি!' টেলর আর্তনাদ করে ওঠে। পিঁপড়ের স্রোত মাত্র কুড়ি হাত দূরে।
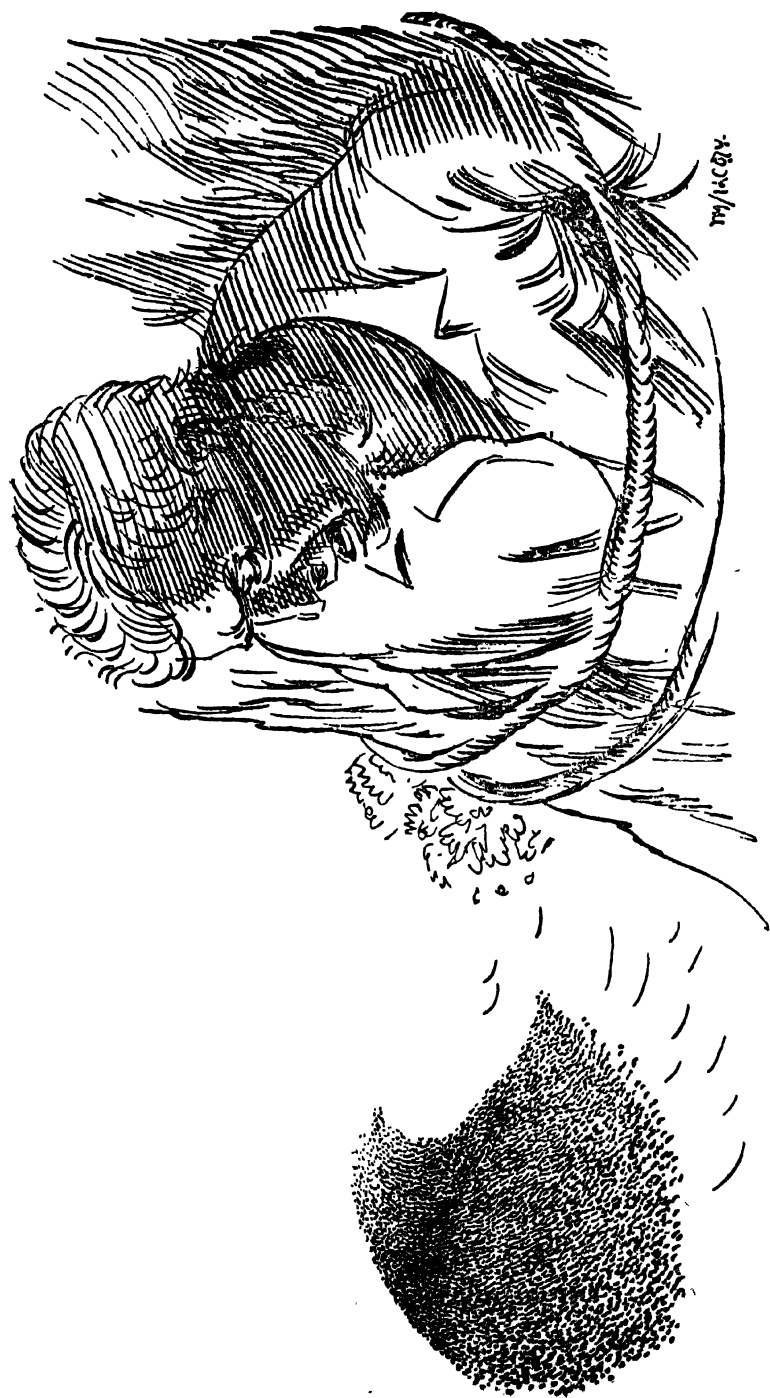
'কোথায়?'

'গুদোম ঘরে, মাটির নিচে সিন্দুকে।'

'উত্তম। সুনন্দ, ওকে খুলে সরিয়ে আন।'

সুনন্দ বলল, 'মিস্টার আন্তোনিও, তুমি কখনও আর্মি-এণ্ট-এর ভোজের ছবি তুলেছো? দারুণ সাবজেক্ট। টেলর যদি অনুগ্রহ করেন—'

'খুলে দাও!' টেলর উন্মাদের মত চেঁচাল। পিঁপড়ে বাহিনী দশ হাত তফাতে। সুনন্দ দ্রুত তার বাঁধন খুলে সরিয়ে আনল।

মামাবাবু বাকি ফেরোমনটুকু গাছের চারপাশে গোল করে ছড়িয়ে দিলেন। টেলরকে বললেন, 'আশা করি সত্যি কথা বলছেন। মিথ্যে হলে কিন্তু এবার নির্ঘাৎ আপনাকে পিঁপড়ের ভোজে লাগাব।'

একটা মজার ব্যাপার দেখলাম। সারিবদ্ধ পিঁপড়েরা এসে গাছের গুঁড়ির চারধারে ক্রমাগত গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করল। চক্কর খেয়েই চলেছে। কখন থামবে কে জানে।

গুদোম ঘরের আবর্জনা সরিয়ে, মেজের তক্তা উঠিয়ে সিন্দুক আবিষ্কার করতে দেরি হলো না। মস্ত সিন্দুক। অনেক খোপ। একটা খুলে মামাবাবু বললেন 'এই যে পেয়েছি।' তিনি ফাইলটা বাইরে-দাঁড়ানো কার্লোর হাতে দিলেন। ভিতরের কাগজপত্রে চোখ বুলিয়েই কার্লো, 'পেয়েছি, পেয়েছি' বলে মামাবাবুকে আনন্দে জাপটে ধরলেন।

আমি দেখলাম, বিল সিন্দুকের অন্য খোপগুলো ঘাঁটছেন। কয়েকটা বড় বড় মোড়ক খুলে মন দিয়ে দেখলেন। ঘরের তাক ও কোণগুলো তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। একটু পরে আমরা বেরিয়ে এলাম।

টেলরকে লেবরেটরীতে একটা চেয়ারে বসিয়ে আমরা ঘিরে বসলাম। টেলরের মুখ ভাবলেশহীন। যেন বেকায়দা অবস্থাটা সে খানিক সামলে নিয়েছে। বলল, 'আপনাদের কার্যসিদ্ধি

হয়েছে। এবার আমায় ছেড়ে দিতে পারেন। মনে রাখবেন। আমার বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগগুলো একটাও কোর্টে টিকবে না। বরং উল্টে আমি আপনাদের বিরুদ্ধে মানহানির মকদ্দমা আনতে পারি।'

উঃ, সাংঘাতিক লোক! কি নার্ভ! একটু হতচকিত হয়ে গেলাম।

বিলের গম্ভীর গলা শুনলাম—'মিস্টার টেলর, আইন-কানুন সম্বন্ধে আপনার বেশ জ্ঞান আছে দেখছি। কিন্তু চোরা কোকেন-কারবারীকেও কি আইন ছেড়ে দেবে? কি বলেন?'

টেলরের মুখ দেখলাম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

'মোহোরোতে আমার এক পুলিশ ইন্‌সপেকটর বন্ধু বলেছিল, টাঙ্গানিকায় চোরা কোকেন চালান খুব বেড়ে গেছে। দলটাকে কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। এদের ব্রেন একজন শ্বেতাঙ্গ। দলের খুব কম লোক তাকে চেনে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টেলর বোধহয় সেই লোক। কি, ঠিক বলছি?'

টেলর রেগে বললেন, 'আমায় মিথ্যে মামলায় জড়াবার চেষ্টা করছেন।'

'বেশ বেশ, পুলিশ আসুক। গুদোম-ঘর সার্চ করুক। তারপর আমার কথার সত্যি-মিথ্যে তারাত বিচার করবে।' টেলর গোঁজ মেরে বসে রইল।

টেলরকে একটা খালি ঘরে বন্দী করে বাইরে থেকে তালা দেওয়া হলো।

মামাবাবু কার্লোকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এখন কি করবেন?'

'ভাবছি ফিরে যাব। আপনারা কবে ফিরছেন?'

'আপনি সঙ্গে গেলে এখুনি ফিরতে পারি।'

'বেশ তাই যাব। আমার কাজ প্রায় শেষ। বাকিটুকু না হয় নাইরোবিতে বসে করব। সেখানে মার্টিন নামে এক ছোকরা

প্রাণিবিজ্ঞানী আছে। বহুবার সে আমার অধীনে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাকে অ্যাসিটান্ট করে নেব। আচ্ছা ঘোষ, এই লেবরেটরীর কি হবে?'

'কেন, যা-যা দরকারী জিনিস আছে সঙ্গে নিয়ে চলুন।'

'কিন্তু এ সব তো টেলরের সম্পত্তি।'

'তাতে কি হয়েছে। টেলর আপনাকে ঠকাতে চেয়েছিল। তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বৈকি।' মামাবাবু নির্বিকারভাবে মন্তব্য করলেন।

পরদিন সকালে টেলরের ঘর খুলে দেখা গেল, পাখি পালিয়েছে। ঘর ফাঁকা। আবিষ্কার হলো, ঘর থেকে পাঁচিলের বাইরে অবধি এক গোপন সুড়ঙ্গ পথ। বিল আপসোস করলেন। 'ঘরটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিল।'

সুনন্দর মন খারাপ হয়ে গেল। 'ইস্, লোকটাকে শাস্তি দেওয়া গেল না। এত বড় জোচ্চোর। তার ওপর আমাদের মারার চেষ্টা করেছিল!'

বিল সুনন্দর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'ব্রাদার, শাস্তি ও পাবে। আর কোনো দিন টেলর সভ্যজগতে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না। জেলের ভয়ে পালিয়ে বেড়াবে। হয়তো ধরাও পড়বে। এও কি কম শাস্তি?'

ঠিক হলো, এখান থেকে আমরা যাব সেই খাদের কাছে। যে ক'দিন হাতে সময় আছে ফসিলের অনুসন্ধান করব। বিল পোর্টার যোগাড় করে ফেললেন। গোসাপ দেবতার ব্যাপারটা ছিল টেলরের কারসাজি। স্থানীয় লোকদের সে ভয় দেখিয়ে রেখেছিল, যাতে তারা খাদে খোঁড়াখুঁড়ি করতে রাজী না হয়। টেলর পালিয়ে যেতে তাদের ভয় ভেঙ্গে গেল।

মামাবাবুর সঙ্গে কার্লোও মহা উৎসাহে ফসিলের সন্ধানে লেগে গেলেন। কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ফসিল উদ্ধার হলো কিন্তু দুঃখের বিষয়, মামাবাবু যে ফসিলটি খুঁজতে এসেছিলেন তা পাওয়া

গেল না।

ছয় দিন পর আমরা ডার-এস-সালাম ফিরে যাবার জন্য তাঁবু ওঠালাম।

ফসিল পেলেন না বলে মামাবাবুর দেখলাম মোটেই দুঃখ নেই। আমি সমবেদনা জানাতে গিয়েছিলাম। হেসে বললেন, 'আরে, এসব আবিষ্কার কি সহজে হয়। লাক্ চাই। কেউ সারা জীবন খুঁজেও পায় না, আবার কেউ দু'দিনেই আবিষ্কার করে ফেলে। তবে হার মানছি না, পরের বছর আবার আসব। আর, শূন্য হাতে ফিরছি কে বলল? এত বড় একটা আবিষ্কার করে ফেললাম যে!'

'কি আবিষ্কার?' আমার ধাঁধা লাগে।

'কেন, ব্রুস টেলরের প্রকৃত পরিচয় আবিষ্কার করলাম। এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিলাম। আর ফাউ হিসাবে কেমন এক অ্যাডভেঞ্চার জুটে গেল বরাতে।'

'তা বটে।' সুনন্দ সায় দিল। 'আফ্রিকায় আমাদের দ্বিতীয় অ্যাডভেঞ্চারটা ভালই হলো!'

আমি বললাম, 'যদিও কিঞ্চিৎ বিপজ্জনক!'

আন্তোনিও আমাদের অনেকদূর অবধি পৌঁছে দিল। তারপর একজন পোর্টার সঙ্গে নিয়ে বিদায় নিল। তাকে যেন একটু মনমরা দেখাচ্ছিল। যাবার আগে বিনা অনুরোধে আমাদের সবাইকার ফটো তুলে সে এক গাদা ফিল্ম নষ্ট করে ফেলল!

সাগর-গৌরব

সাড়ে-পাঁচ—সাড়ে-পাঁচ। মাত্র সাড়ে-পাঁচ টাকা। আর কেউ ডাকবেন?—ঠং!

হাতুড়ির তৃতীয় ঘা-টা পড়া মাত্র সুনন্দ বোকার মতো আমার মুখের দিকে চাইল।—এ্যাঁ। কেউ আর ডাকল না যে!

আমি বললাম, ঠিক হয়েছে। কর মজা। এবার সাড়ে-পাঁচ টাকা খসা।

—তুই যে বললি সাত-আট উঠবে?

—আমি কি ডাকতে বলেছি?

—কিন্তু আমার কাছে যে মোটে চার টাকা আছে।

—তা বললে তো হবে না।

—দে ভাই, দেড় টাকা ধার দে।

—না।

—দে ভাই, প্রেস্টিজ বাঁচা।

—বেশ, চার আনা সুদ চাই।

—তাই দেব। উঃ, কি ঝামেলায় পড়লাম। এখন ঐ গোবদা শাঁখটা হাতে নিয়ে রাস্তায় ঘুরতে হবে। মামাবাবু কিন্তু দাঁড়িয়ে মিটমিটিয়ে হাসছিলেন।

ব্যাপারটা হয়েছিল কি—পার্ক স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা তিনজন। মামাবাবু অর্থাৎ আমার বন্ধু সুনন্দর মামা প্রফেসর নবগোপাল ঘোষ, সুনন্দ ও আমি। কয়েক দিন পরে আমরা আন্দামানে যাবো, তাই কিছু কেনাকাটার ব্যাপার ছিল। হঠাৎ

দেখি ফুটপাতে ভিড়। নীলাম হচ্ছে। দাঁড়িয়ে গেলাম। কোন পুরনো আমলের বড়লোকের বাড়ির জিনিসপত্র নীলামে চড়েছে। ভারি ভারি কাঠের আসবাব। পাথর আর কাঁচের সৌখিন জিনিস। আমাদের কিছু কেনার ইচ্ছে ছিল না। তবু দাঁড়ালাম দেখতে।

এক একটা জিনিস নীলামে ওঠে। প্রতিযোগী ক্রেতাদের ডাকাডাকি জমে ওঠে। দর্শকদের মধ্যেও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আমি ও সুনন্দও সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে নানারকম আওয়াজ করি। মামাবাবু এই সুযোগে রাস্তার ওপর একটা স্টলে বই হাঁটকাতে শুরু করলেন।

একটা শাঁখ উঠল নীলামে। চমৎকার দেখতে শঙ্খটা। দুধের মত শাদা। মস্ত বড়। অতীতে শাঁখটির সুগম্ভীর ধ্বনিতে কোনো অট্টালিকা প্রতি সন্ধ্যায় গম্‌গম্ করে উঠত।

দর আরম্ভ হয় দু'টাকা থেকে।

—কত দাম হবে শাঁখটার? সুনন্দ জিজ্ঞেস করে।

—সাত-আট তো নিশ্চয়। না জেনেই বলে দিই।

দুই থেকে তিন। তিন থেকে চারে উঠল ডাক।

সুনন্দর মাথায় হঠাৎ দুর্বুদ্ধি চাপল। বলল—একটু মজা করা যাক। ডাক চড়াই। সে গলা বাড়িয়ে ডাক দিল—সাড়ে চার।

অমনি আর একজন ডাকল—পাঁচ।

সুনন্দ—সাড়ে-পাঁচ। ব্যস, ঐ সাড়ে-পাঁচেই শেষ।

শাঁখ হাতে নিয়ে সুনন্দ বেরিয়ে এল। মামাবাবু দেখে বললেন, বাঃ, এ তো খাসা জিনিস। সাজিয়ে রেখো ড্রয়িংরুমে। সুনন্দর মুখ কিন্তু হাঁড়ি। নীট পাঁচ টাকা বার-আনা গচ্চা গেল।

খানিকটা এগিয়েছি। দুটি লোক এসে পাশে দাঁড়াল। তারপর একজন সুনন্দকে বলল, বাবু, আপনারা কি শাঁখ জমান? মানে, কেনেন?

—না। সুনন্দ গম্ভীর বদনে জবাব দেয়।

লোক দু'টি কিন্তু যায় না। একটু ইতস্ততঃ করে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে।

এক নজরে জরীপ করে নিলাম তাদের।

দু'জনেরই গায়ের রঙ বেশ কালো। পরনে ময়লা ফুলপ্যাণ্ট এবং রঙচঙে স্পোর্টস্ গেঞ্জি। পায়ে চীনেবাজারী জুতো। যে সুনন্দকে শাঁখের কথা বলেছিল সে লোকটি বেশ ঢেঙা। রোগা পাকানো চেহারা। মুখের মধ্যে বিশেষত্ব, তার বেজায় লম্বা নাক এবং কপালে ডুমুরের মতো কালো আঁচিল।

সঙ্গীটি বয়সে বড়। মাথায় খাটো। শরীর লোমশ। মাথায় নীল জাহাজী টুপি। গালভাঙা চোয়াড়ে মুখ। তার হাতের কবজি থেকে সারা বাহুময় নানা রকম উল্কি কাটা।

—আমার কাছে একটা শাঁখ আছে। খুব সুন্দর। একেবারে নতুন ধরনের। দেখবেন? লোকটি আবার বলে।

—বললাম তো—না। সুনন্দ রেগে ওঠে।

—কে তোমরা? মামাবাবু জিজ্ঞেস করেন।

—আজ্ঞে, আমরা জাহাজী খালাসী।

—কী নাম তোমাদের জাহাজের?

বুঝলাম মামাবাবু লোকদুটোকে যাচাই করে নিচ্ছেন।

—সাগররাণী। এম ভি সাগররাণী।—ঢ্যাঙা বলল।

—ও কী শাঁখ? আছে কাছে? দেখি!

লোকটি বলল। এখন কাছে নেই বাবু। তবে যদি ঠিকানা দেন তো নিয়ে যাব আপনার বাসায়।

—বেশ। এই ঠিকানায় এস। কাল বিকেল পাঁচটায়। আমরা জমাই না, তবে এই ভদ্রলোক জমান।

মামাবাবু পকেট থেকে পেন নিয়ে একটা বাসের টিকিটের পিছনে খস্‌খস্ করে ঠিকানা লিখতে লিখতে বলেন—যদি নতুন ধরনের শাঁখ হয় তো কিনতে পারেন। তবে আজেবাজে জিনিস

হলে কিন্তু নেবেন না। সেই বুঝে আসবে। আমরাও থাকব।

ঠিকানাটায় চোখ বুলিয়ে সে বলে—নিউ আলিপুর। হ্যাঁ, চিনি। ঠিক আছে, যাব কাল। সাচ্চা জিনিস ছাখবেন। আচ্ছা চলি এখন, সেলাম।

সুনন্দ বলল। কার ঠিকানা দিলেন?

—ডক্টর চট্টোরাজ।

—চট্টোরাজ ফিরেছেন নাকি? অনেকদিন তো বাইরে ছিলেন।

—হ্যাঁ, আজই ফিরেছেন খবর পেয়েছি। আন্দামান যাবার আগে যাব ওঁর কাছে। একটা উপলক্ষ্য জুটে গেল।

—কোন চট্টোরাজ? যাঁর সী-শেল-এর কালেক্‌সন আছে? আমি জিজ্ঞেস করি।

—হুঁ। মামাবাবু মাথা নাড়েন।

—আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে।

—নিশ্চয়। চট্টোরাজের মিউজিয়ম তুমি দেখেছ?

—না, দেখিনি। নাম শুনেছি। দেখার খুব ইচ্ছে। কিন্তু যতবার দেখবার প্ল্যান করেছি, শুনেছি ভদ্রলোক কলকাতার বাইরে।

—হুঁ, খুব ঘোরেন। দেশে বিদেশে বেড়ান আর সী-শেল খোঁজেন। এবার তিনমাস জাপানে ছিলেন। নিশ্চয় কিছু ভাল শেল্ নিয়ে এসেছেন।

ডঃ চট্টোরাজের মিউজিয়ম বিখ্যাত। নানা রকম দুষ্প্রাপ্য সী-শেল্ অর্থাৎ সামুদ্রিক শঙ্খ, ঝিনুক, কড়ি ইত্যাদি আছে তাঁর সংগ্রহশালায়। চট্টোরাজ আগে থাকতেন বম্বেতে। বছরখানেক হলো কলকাতায় বাড়ি করে বসবাস করছেন। ভদ্রলোকের নাকি অগাধ পয়সা। একলা মানুষ, কাজেই তাঁর 'হবি'র পিছনে প্রচুর খরচ করতে পিছপা হন না। যাক্, এই সুযোগে সংগ্রহ-শালাটি দেখা হয়ে যাবে ভেবে খুশি হয়ে উঠলাম।

॥ ২ ॥

ডঃ চট্টোরাজের বাড়িটি দোতলা। মাঝারি আকার। দরজার কলিং বেল টেপার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে কোনো কুকুরের প্রচণ্ড তর্জন-গর্জন শোনা গেল। দরজা খুলে দিল এক ভৃত্য। ভিতরে পা বাড়ানো মাত্র একটা বিশাল এ্যালসেসিয়ান কুকুর এসে সব্বাইকে শুঁকতে শুরু করল। চট্টোরাজ বোধহয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। চটির আওয়াজ তুলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হাঁক দিলেন—ভোম্বল, কি হচ্ছে ?

অমনি কুকুরটি লেজ নাড়তে নাড়তে ঘরের এক কোণে গিয়ে বসে পড়ল।

চট্টোরাজ আনন্দ-উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন—আসুন আসুন প্রফেসর ঘোষ। আজই প্ল্যান করছিলাম আপনার ওখানে একবার ঢুঁ মারব, হঠাৎ আপনার ফোন এল। কি ব্যাপার ? কে শঙ্খ বিক্রি করতে চায় ? দেখেছেন স্পেসিমেনটা ?

—না, দেখিনি। দু'জন খালাসী। বলছে নতুন ধরনের জিনিস।

—ক'টায় আসবে ?

—পাঁচটায় অর্থাৎ এখনও আধঘণ্টা বাকি।

—ঠিক আছে। ভাল হলে তো আমি সর্বদাই কিনতে প্রস্তুত। চলুন ড্রইংরুমে বসা যাক।

ডঃ চট্টোরাজ বয়সে প্রৌঢ়, লম্বা শক্ত চেহারা। মুখে কাঁচা-পাকা মেশানো ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। মোটা কাঁচের চশমার আড়ালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। পরনে পাঞ্জাবী ও পাজামা। হাতে ধূমায়িত চুরুট। চট্টোরাজ বললেন—সুনন্দ, ভাল আছ তো ? ওটি কে ? তিনি আমাকে দেখালেন।

সুনন্দ বলল—আমার বন্ধু অসিত রায়। ওর ইচ্ছে আপনার মিউজিয়ম দেখবে, তাই সঙ্গে এসেছে।

চট্টোরাজ বললেন, সে তো ভালো কথা। তবে কিনা আজ

থাক। ঐ দেখ আমার মিউজিয়ম। তিনমাস বন্ধ ছিল, আজ সবে খুলেছি। ঘরের মধ্যে মাকড়সার জাল হয়েছে, ধুলো জমেছে। তাছাড়া একটু গোছগাছ করা দরকার। দু'দিন পরে এস, আমি নিজে তোমায় দেখিয়ে বুঝিয়ে দেব। কিছু মনে করলে না তো?

আমি বললাম, তাতে কি হয়েছে। দু' তিনদিন পরে আসতে আমার কোন অসুবিধা নেই।

—হ্যাঁ, বিকেল চারটে থেকে ছ'টা। এই সময় প্রত্যেকদিন আমি বাড়ি থাকি। ঠিক এস কিন্তু। ড্রইংরুমের লাগোয়া একটা হলঘর দেখা যাচ্ছিল। মাঝখানের কাঠের দরজার পাল্লা দুটো খোলা। পিছনে কোলাপসিবল গেট কিছুটা ফাঁক করা। ঘরের ভিতর অনেকগুলো আলো জ্বলছে। দেখা যাচ্ছে, লম্বা লম্বা টেবিলের ওপর সারি সারি কাঁচের শো-কেস্ বসানো। ড্রয়ার লাগানো অনেকগুলো আলমারি। লোভ হচ্ছিল আজই দেখি। থাক্, ভদ্রলোক যখন আপত্তি করছেন, দু'দিন অপেক্ষা করি।

মামাবাবু বললেন, জাপান থেকে কি আনলেন? স্পেসিমেন কিছু পেলেন নাকি?

—হুঁ, পেয়েছি। নিচে এনে রেখেছি আপনাদের দেখাব বলে —ঐ যে।

ঘরে এক কোণে একটা টেবিলের ওপর দেখলাম অনেকগুলো ঝিনুক, কড়ি ও শাঁখ। নানা রঙের, নানা আকারের।

টেবিলের চারপাশে আমরা ঘিরে দাঁড়ালাম।

আরেব্বাস! এটা কি? ঝিনুক মনে হচ্ছে? কিন্তু খোলাগুলো একেকটা মাঝারি সাইজের কড়াইয়ের মতো বড়, আর তেমনি মোটা। খোলার গা-টা ঢেউ খেলানো। হাল্কা হলদেটে সবুজ রঙ। জিজ্ঞেস করলাম—এটা কি ঝিনুক?

—ঝিনুক বৈকি। জায়াণ্ট-ক্ল্যাম। এটা সাড়ে-তিন ফুট লম্বা। আরও বড় হয়, চারফুট অবধি। চট্টোরাজ বলেন।

—উঃ কি প্রকাণ্ড! আমি সেই রাক্ষুসে ঝিনুকের গায়ে হাত

বোলাতে বোলাতে বলি।

—হ্যাঁ, ষাট-সত্তর হাজার সামুদ্রিক শেল-এর মধ্যে এদের আকার সব চেয়ে বড়। জানেন প্রফেসর ঘোষ, ক্ল্যামটা স্রেফ জলের দরে পেয়েছি। একজন জাপানী মাঝি ধরেছিল। ভিতরে এই মুক্তোটি ছিল।

টেবিলে রাখা কাগজের বাক্স খুলে তিনি বড় মার্বেলের আকারে একটি হালকা গোলাপীরঙা মুক্তো বের করলেন।

যেমন ঝিনুক তেমনি মুক্তো বটে!

—কত দাম হবে মুক্তোটার? আমি জিজ্ঞেস করি।

—খুবই কম। চট্টোরাজ হাসেন। এই ঝিনুকে যে মুক্তো জন্মায়, তা নেহাতই নিকৃষ্ট জাতের। ঐ দেখতেই যা মস্ত বড়।

মামাবাবু ও চট্টোরাজমশাই জাপান থেকে আনা শেলগুলির রঙ আকার ইত্যাদি নিয়ে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ডুবে গেলেন। খানিকক্ষণ হাঁ করে শুনলাম। বিশেষ বুঝলাম না। তাই উঠে পড়ে টি-পয়ের ওপর রাখা একগাদা নানা ধরনের পত্রিকা ছিল, সেগুলো ঘাঁটতে লাগলাম।

—আরে, পাঁচটা বেজে দশ। কই মশাই, আপনার খালাসীরা এল না? চট্টোরাজ হঠাৎ বলে ওঠেন।

—হুঁ, তাই তো দেখছি। কে জানে শেষ পর্যন্ত আসবে কিনা। হয়ত অন্য খদ্দের পেয়ে গেছে। মামাবাবু বললেন।

আবার দু'জনে আলোচনায় মেতে যান।

আরও মিনিট কুড়ি কেটেছে। হঠাৎ কলিং বেলের বদলে দরজায় ধাক্কার শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বল বিকট স্বরে হাউ হাউ করতে করতে দরজার দিকে ছুটল। ডঃ চট্টোরাজ গিয়ে দরজা খুললেন।

খুলতেই দেখি দুই খালাসী বাইরে দণ্ডায়মান। চেঁচিয়ে বলল —বাবু, কুত্তাটারে বাঁধেন।

চট্টোরাজ মশাই এক ধমক লাগালেন ভোম্বলকে। সে

সুড়সুড় করে গিয়ে আগের জায়গায় শুয়ে পড়ল।

লোক দুটিকে ড্রয়িংরুমে চেয়ারে বসতে বলা হল। তারা একটু জড়সড় হয়ে বসল।

চট্টোরাজ হাত বাড়ালেন—কই, এনেছো ?

লম্বা লোকটি থলির মধ্য থেকে একটি শাঁখ বের করে তাঁর হাতে দিল।

সত্যি অদ্ভুত দেখতে শাঁখটা। প্রায় এক হাত লম্বা। মেটে-মেটে রঙ। পিছন দিকটা সরু লম্বা। মাথার দিক লাট্টুর মতো পাক খাওয়ানো।

চট্টোরাজ বললেন—এটা কোত্থেকে পেয়েছ ?

—একজন আরবী জাহাজী দিয়েছে।

—এমনি দিয়ে দিল ?

—বাজী হেরে গিয়েছিল।

—ও, জুয়া বুঝি ?

শাঁখের মালিক কাঁচুমাচু ভাবে হাসল।

চট্টোরাজ আমার দিকে চেয়ে বললেন—এর নাম হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ট্রাম্পেট্। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় জাতের শাঁখ। অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে পাওয়া যায়। অবশ্য খুব দুর্লভ স্পেসিমেন নয়।

মামাবাবু বলে উঠলেন, আপনার তো এ জিনিস একটা রয়েছে।

—হ্যাঁ, আছে। তবে এ স্পেসিমেনটি ভাল। আমি রাখতে পারি, পঞ্চাশ টাকা দেব। চলবে ?

শাঁখের মালিক তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তার মুখ দেখে মনে হলো এত টাকা সে আশা করেনি।

চট্টোরাজমশাই টাকা আনতে উঠে গেলেন।

টাকা হাতে পাওয়া মাত্র তারা দু'জনে উঠে দাঁড়াল। চট্টোরাজ বললেন, বস বস, চা খেয়ে যাও। চা-পানের প্রতি তাদের যথেষ্ট

আগ্রহ দেখা গেল এবং হাসি-হাসি মুখে ফের চেয়ার নিল।

মকবুল মাঝে মাঝে উৎসুক ভাবে মিউজিয়ম ঘরটির দিকে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ চট্টোরাজ মশাইকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে —ঐ ঘরেই বুঝি শাঁখ জমান? ঐ যে কাঁচের বাক্সগুলো দেখছি, ওর মধ্যে বুঝি সাজিয়ে রাখেন?

চট্টোরাজ বললেন, শুধু শাঁখ কেন, সমুদ্রের ঝিনুক, কড়ি ইত্যাদি সব রকম শেলই রয়েছে।

—সব কেনা?

—বেশির ভাগ কেনা। কিছু আমি নিজের হাতে কুড়িয়েছি।

—অনেক দাম দিয়ে কিনেছেন?

—হ্যাঁ, কিছু আছে রীতিমতো দামী। তবে সবচেয়ে দামী যে শাঁখ, সে শাঁখ আমার কাছে নেই।

আমরা চট্টোরাজের দিকে কৌতুহলী দৃষ্টি দিলাম। মকবুলও দেখি হাঁ করে তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

—কোনাস-গ্লোরিয়া মারিস, না?—মামাবাবু জিগ্যেস করলেন।

—এগ্‌জ্যাক্টলি। চট্টোরাজ বললেন।—ইংরিজিতে দ্য গ্লোরি অফ দ্য সী। বাংলায় বলা চলে সাগর-গৌরব।

—সাগর-গৌরব—বাঃ! মকবুলের দৃষ্টি উদ্ভাসিত। কত দাম হবে এ শাঁখের বাবু?

চট্টোরাজ পাশের টেবিল থেকে একটা মোটা বই তুলে নিয়ে তার একটা পাতা আমাদের সামনে খুলে ধরলেন। দেখি একটা শাঁখের ছবি। লম্বায় ইঞ্চি চারেক, দেখতে ঠিক যেন একটা 'আইস্‌-ক্রীম কোন'। তলার দিকটা ছুঁচলো হয়ে নেমে এসেছে, উপরের দিকটা লাট্টুর মতো পাক খেয়ে সরু হয়ে গেছে। রং ফিকে হলদে, তার উপরে গাঢ় রঙের চিত্র-বিচিত্র সূক্ষ্ম নক্‌সা।

চট্টোরাজ বললেন—এই হল সাগর-গৌরব। প্রায় সাত হাজার টাকা পর্যন্ত দাম উঠেছে এই শাঁখটার।

—বলেন কি বাবু, সাত হা—জা—র! মকবুল একেবারে থ।

চট্টোরাজ হাসলেন।

মকবুল ও আকবর চা-বিস্কুট খেয়ে উঠে পড়ল। দু'জনেই কেমন যেন থুম্ মেরে গেছে। দরজার মুখটাতে গিয়ে মকবুল বলল—দেখুন বাবু, আমরা জীবনভোর সমুদ্দুরে ঘুরতাছি, কতরকম শাঁখ-ঝিনুক হাতে পাই, ফেইলা দিই। ওদের মধ্যে আবার এমন দামী জিনিস আছে, তা কস্মিন কালে শুনি নাই।

—এবার তো শুনলে। মামাবাবু হেসে বললেন।—এখন থেকে কোনো নতুন ধরনের শাঁখ-ঝিনুক পেলে নিয়ে আসবে। ভালো জিনিস আনলে ভালো দাম পাবে।

—আচ্ছা, বিদায় হই। সেলাম···

॥ ৩ ॥

পোর্টব্লেয়ারে একটি সরকারী রেস্ট হাউসে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। মামাবাবুর পরিচিত নিমাই দাস নামে এক ভদ্রলোক বন্দোবস্ত করেন দিয়েছিলে। নিমাইবাবু এখানে কাঠের ব্যবসা করেন। অনেকদিন আছেন।

চমৎকার একটি বাংলো বাড়ি। টিনের সবুজ চালা, কাঠের দেয়াল। বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা আছে। অনেকখানি ঘেরা কম্পাউণ্ড। বাড়িটায় ঢুকতেই চোখে পড়ে, পাশে ছাতার মতো একটা প্রকাণ্ড গুলমোহর গাছ।

এ অঞ্চলটার নাম হাড্ডা। এখন বাংলায় শীত পড়ে গেছে। কিন্তু এখানে শীতের নাম-গন্ধ নেই। দাসমশাই, অর্থাৎ নিমাই দাস, বললেন—আন্দামানে গ্রীষ্ম বা শীতকাল বলে কিছু নেই। বর্ষা আর শরত, ব্যস্। এই দুই ঋতু। সব সময় হু হু করে সমুদ্রের হাওয়া ছুটছে। খাসা আবহাওয়া। ক'দিন থাকুন, দেখবেন গায়ে গত্তি লেগে যাবে (কথাটা মনে হলো আমাকেই কটাক্ষ করে বলা হলো)।

সকালে পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছেছিলাম। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার

পর আমি ও সুনন্দ ঠিক করলাম একটা চক্কর মেরে আসি। মামাবাবু একগাদা বই ম্যাপ ইত্যাদি নিয়ে তখন মহা ব্যস্ত। বললেন. তোমরা যাও, আমি আজ বেরব না॥

একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলাম, বললাম—পোর্টে চল।

উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথ দিয়ে ট্যাক্সি চলল। পোর্টব্লেয়ারের সঙ্গে একটা ব্রীজ দিয়ে সংযুক্ত চ্যাথাম দ্বীপ। জাহাজ এসে থামে এই চ্যাথাম জেটিতে। পোর্টে এসে ট্যাক্সি থেকে নেমে এদিক-ওদিক ঘুরছি, এমন সময় একটা নোঙর-করা জাহাজের দিকে চোখ পড়ল। জাহাজের গায়ে সাদা অক্ষরে লেখা এম ভি সাগররাণী। ওমা—এই তো সেই জাহাজ, যাতে মকবুল আর আকবর' খালাসীর কাজ করে! তাহলে ওরাও আন্দামানেই এসেছে!

সুনন্দ বলল—চল, ওদের খোঁজ করি। লোক দুটো বেশ ইণ্টারেস্টিং।

এদিক-ওদিক ঘুরে দু'তিনজনকে জিজ্ঞেস করার পর শেষটায় সাগররাণীর এক খালাসীকে পাকড়াও করা গেল। সে বলল—মক্‌বুল? আকবর? তারা তো জাহাজে নেই।

—কোথায় গেছে জান?

—না বাবু। তবে আপনারা চাচার কেবিনে খোঁজ করে দেখতে পারেন।

—চাচার কেবিন? সে আবার কোথায়?—সুনন্দ জিজ্ঞেস করল।

—ওই তো ডকের কাছে। রাস্তার বাঁ-ধারে। কাউকে জিগ্যেস করলেই দেখিয়ে দেবে।

টিনের চালার লম্বা নিচু ঘর। ভিতরে কয়েকটা কাঠের টেবিল ও বেঞ্চি পাতা। কয়েকজন মাঝি-মাল্লাজাতীয় লোক বসে। দরজার মুখে ক্যাসবাক্স সামনের শ্বেত শ্মশ্রু, ময়লা লক্ষ্ণৌ ফেজ মাথায় যে বৃদ্ধটি বসে আছে, ওই নিশ্চয় স্বনামধন্য চাচা।

ঢুকে প্রশ্ন করলাম—মকবুল আর আকবরকে চেনেন? সাগররাণী

জাহাজে কাজ করে।

—জরুর! চাচা জবাব দেয়। আপনারা কোথেকে আসছেন? তার চোখে বিস্ময়। ওদের কি দরকার?

—দরকার বিশেষ কিছু নয়। কলকাতায় আলাপ হয়েছিল। কলকাতা থেকে আমরা বেড়াতে এসেছি।

চাচা মাথা দুলিয়ে দাড়ি নেড়ে বলল, হুঁ হুঁ, তারা এখানে

আসে বটে। সব জাহাজী লোকই আমার কেবিনে আসে। ওরা দু'জন এবারও তো এসেছিল তিন-চারদিন আগে। জাহাজ

থেকে নেমে এল, খেল-দেল। কিন্তু তারপর আর পাত্তা নেই। জাহাজে খোঁজ করেছিলেন?

—করেছিলাম। নেই, আমি বলি। যাহোক, ওরা এলে বলবেন, সেই যাদের সঙ্গে কলকাতায় নীলামের দোকানের সামনে আলাপ হয়েছিল—তারা এসেছে। তাহলেই বুঝতে পারবে। আমরা হাড্ডাতে রেস্ট-হাউসে আছি।

চাচার কেবিন থেকে এক পা বেরিয়েই সুনন্দ হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। নাক উঁচু করে বুক ভরে এক শ্বাস নিয়ে বলল, আঃ। এই খালাসীদের কেবিনগুলোয় মাংস যা বানায়, দুর্দান্ত।

সুগন্ধটি আমারও নাকে পাচ্ছিলাম। তবু একটু ইতস্ততঃ করে বলি—বড্ড নোংরা কিন্তু।

—দূর, তাতে কি হয়েছে। চল।

আমাদের মতো খানদানী খদ্দের পেয়ে চাচা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। —কি খাবেন? কাবাব না কালিয়া? রুটি ভাত দুইই আছে।

শুনলাম পাঁঠার চেয়ে হরিণের মাংস দামে শস্তা, কারণ আন্দামানে নাকি প্রচুর বুনো হরিণ পাওয়া যায়। যে কেউ মারতে পারে। অতি উত্তম। মৃগমাংসই অর্ডার দিলাম।

নোংরা বেঞ্চি। ততোধিক নোংরা প্লেট, বাটি। যারা রাঁধে বা পরিবেশন করছে তারাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ধার-টার ধারে না। কিন্তু সত্যি কি অপূর্ব স্বাদ রান্নার! কি মশলা দেয় কে জানে!

বাংলোয় ফিরে দেখি, মামাবাবু একটা মস্ত ম্যাপের ওপর উবু হয়ে কি জানি দেখছেন। পাশে অনেকগুলো বই ছড়ানো। আমরা ঢুকতেই মুখ না তুলেই প্রশ্ন করলেন, কোথায় গিয়েছিলে?

—পোর্টে।

—মকবুলদের দেখা পেলে?

—আপনি জানলেন কি করে? আমি বললাম। আমরা দু'জনেই অবাক।

—আন্দাজ করলাম। সাগররাণী দাঁড়িয়ে আছে, সেটা তোমরা

না দেখলেও আমি দেখেছি।

—না, পেলাম না। আমি বলি। জাহাজ থামতেই তু'জনে কোথায় নেমে গেছে তারপর আর ফেরেনি। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করি—ওটা কিসের ম্যাপ ?

—আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের। আন্দামানের তুশো চারটে দ্বীপের মধ্যে সাধারণ ম্যাপে মাত্র পনের কুড়িটার নাম থাকে। এখানে অনেক বেশি আছে। অবশ্য বহু দ্বীপের এখনও কোন নামই নেই।

আমরা কাছে থেকে ঝুঁকে ম্যাপটা দেখি। ম্যাপের ওপর আঙুল দেখিয়ে মামাবাবু বললেন—এই আন্দামান নিকোবর দ্বীপগুলি আসলে পাহাড়ের মাথা। বর্মার দক্ষিণ প্রান্তে কেপনেগ্রিস থেকে আরম্ভ করে আন্দামান-নিকোবর হয়ে সুমাত্রা জাভা পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণী রয়েছে। কিন্তু তার বেশীর ভাগই সমুদ্রের নিচে। শুধু উঁচু জায়গাগুলো দ্বীপ হয়ে জেগে আছে। খুব বেশী হলে সম্ভবত আড়াই থেকে তিন কোটি বছর আগে হিমালয় পর্বত সৃষ্টি হওয়ার সময়ই এই পর্বতশ্রেণীর জন্ম।

—কি করে হলো ? আমি প্রশ্ন করি।

—সমুদ্রগর্ভে বিরাট কোনো আলোড়ন।

—আচ্ছা, এদের মধ্যে আগ্নেয়দ্বীপ আছে? প্রশ্নটা হঠাৎ আমার মাথায় আসে।

—আছে বৈকি! অনেকগুলো। ব্যারেন আইল্যাণ্ডের নাম শুনেছ ? ভারতের একমাত্র জীবন্ত আগ্নেয়গিরি, এইতো কাছেই। পোর্টব্লেয়ার থেকে তিরিশ-চল্লিশ মাইল দূরে। মাঝে মাঝে ধোঁয়া বেরোয়। একদিন যাওয়া যাবে।

॥ ৪ ॥

পরদিন সকালে চা খাচ্ছি। গোঁ-গোঁ করতে করতে এক জীপ এসে থামল। দাসবাবু এলেন। নিমাইবাবু গোলগাল হাসিখুসি লোক। খুব চেঁচিয়ে থাক বলেন। গেট থেকেই হাঁক পাড়লেন—

কেমন আছেন, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? যা দরকার বলবেন। আপনারা মেনল্যাণ্ডের লোক, অতিথি, তারপর প্রফেসর ঘোষের মতো নামকরা সায়ান্টিস্ট এসেছেন রিসার্চ করতে। দ্বীপের বদনাম হলে আমি মুখ দেখাতে পারব না মশাই।

দাসবাবুর জন্য চা এল। চায়ে চুমুক দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—বেরিয়েছিলেন?

মামাবাবু বললেন, আমি বেরুইনি, ওরা দু'জন একটু ঘুরে এসেছে।

—কোথায়?

—পোর্টে গিয়েছিলাম।

—পোর্টে? কেন?

—এমনি।

—সেলুলার জেল দেখেছেন?

—না।

—সে কি! পোর্টব্লেয়ারে এসে এখনও সেলুলার দেখেননি? অবাক কাণ্ড!

মহা মুস্কিল, এসেছি তো মোটে একদিন। আমি ভাবি।

—চলুন চলুন, এক্ষুনি উঠুন। সেলুলার দেখতে যাব।

আমরা তো এক পায়ে খাড়া। মামাবাবুর বোধহয় এখন বেরবার ইচ্ছে ছিল না, দাসবাবুর তাড়ায় উঠলেন।

পানাম জেটির কাছেই বিখ্যাত সেলুলার জেল। বৃটিশ আমলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদের এখানে পাঠানো হতো। সমুদ্রের ঠিক ধারেই তিনতলা উঁচু বিরাট কারাগার। উল্টো দিকে রস আইল্যাণ্ড।

দাসবাবু বললেন, এক সময় জেলে ছিল সাতটা অংশ। মোট সাতশো ঘর। এখন মাত্র দুটি অংশ খাড়া রয়েছে। যুদ্ধের সময় জাপানী বোমায় কয়েকটা অংশ ভেঙ্গে পড়েছে। বাকি কিছুটা পুরনো অব্যবহার্য হয়ে গেছে। এখন দেখছেন, জেলের চারপাশে হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে!

সবাই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে এক অতীত ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। দুর্ধর্ষ অপরাধীদের যেমন এখানে শাস্তিভোগ করতে পাঠানো হতো, তেমনি পাঠানো হতো রাজনৈতিক বন্দীদের। ঐ ছোট ছোট অন্ধকার কক্ষগুলির মধ্যে ভারতের স্বাধীনতাযজ্ঞে আত্মত্যাগী কত মহান বীরের জীবনের অমূল্য সময় তিল তিল করে নষ্ট হয়েছে। অত্যাচার ও অপরিসীম কষ্টে তাদের কারো কারো জীবনদীপ অকালে নিভে গেছে।

দাসবাবু জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন, আমি এখানে এলেই প্রণাম করি। এ তো জেল নয় মশাই, মন্দির, তীর্থস্থান। ভারতমাতার কত বীর সন্তানের পদধূলি পড়েছে ঐ ঘরগুলোয়। দ্বীপ পবিত্র হয়ে গেছে।

সেলুলারের সামান্য দূরে রস্ আইল্যাণ্ড। দাসবাবু বললেন, সমুদ্র শান্ত রয়েছে। চলুন রস্ দেখে আসি। আগে ঐ দ্বীপে ছিল আন্দামানের চীফ কমিশনারের কোয়ার্টার।

চীফ কমিশনারের বাগান-ঘেরা প্রকাণ্ড বাংলোটির এখন জীর্ণ অবস্থা। ঘর-দোর ভেঙ্গে পড়েছে। আগাছা জন্মেছে। জন-প্রাণীহীন ভূতুড়ে বাড়ি। একধারে হ্যারিয়েট পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দাসবাবু জানালেন, পাহাড়ের মাথায় একটি বাংলো ছিল। কমিশনার গ্রীষ্ম কাটাতেন।

হঠাৎ দাসবাবু মোটা গলায় গর্বিত স্বরে ঘোষণা করলেন, জানেন, এখানে নেতাজী ছিলেন, এই কমিশনারের বাড়িতে।

—নেতাজী! মানে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস? সুনন্দ আশ্চর্য হয়ে বলে।

—হ্যাঁ। মহাযুদ্ধের সময় জাপানীরা আন্দামান অধিকার করার পর নেতাজী আসেন। ১৯৭৩ সালে। তিনি ময়দানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিলেন। ঘোষণা করেন, আন্দামান আর বৃটিশের পদানত নয়, স্বাধীন। যারা সে

দৃশ্য দেখেছিল তারা আজও ভুলতে পারেনি। প্রায়ই গল্প করে।

ফেরার পথে মামাবাবু বললেন, দাসবাবু, একজন লোক যোগাড় করে দিতে পারেন? স্থানীয় অধিবাসী। এখানকার দ্বীপগুলো মোটামুটি চেনে। আমাদের সঙ্গে ঘুরবে। অনেকটা গাইডের কাজ করবে। তার নিজের নৌকো থাকলে ভাল হয়। ধারে-কাছের দ্বীপে তার নৌকোতেই যাব। উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেব তাকে।

—বুঝেছি। অ্যাডভেঞ্চার। মানে বৈজ্ঞানিক অভিযান।

—না না, তেমন সিরিয়াস কিছু নয়। মামাবাবু বললেন। বেড়ানো হবে, তার সঙ্গে কিছু স্পেসিমেন যোগাড়।

দাসবাবু একটুক্ষণ মাথা চুলকে বললেন, হুঁ, পেয়েছি, খ্যাপা।

—এঁ্যা, খ্যাপা!

—হ্যাঁ। ভাল নাম রসিক মাঝি, তবে সবাই ডাকে খ্যাপা। লোকটা একটু খেপাটে। কিন্তু ওর মতো এ-সব দ্বীপ আর কেউ চেনে না। ওর নেশাই হলো নৌকো নিয়ে এ-দ্বীপ সে-দ্বীপ চষে বেড়ানো। নিজের নৌকোও আছে। তবে এখন ও পোর্ট-ব্লেয়ারে আছে কি না জানি না। ঠিক আছে। আমি খোঁজ করে বিকেলে এসে বলে যাব। ওকে পেলেই আপনার সব চেয়ে সুবিধা হবে।

বিকেলে দাসবাবু এসে বললেন, খ্যাপা রয়েছে, খবর পেয়েছি। ও থাকে চিড়িয়াটাপুতে, পোর্টব্লেয়ার দ্বীপের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে। আমিই আপনাদের ওর কাছে নিয়ে যেতাম কিন্তু দুঃখের বিষয় কাল আমায় মিডল আন্দামান যেতে হচ্ছে। কয়েকদিন থাকতে হবে। বুঝলেন তো, ব্যবসা করে খাই, একটু প্রাণভরে আড্ডা মারব তার কি উপায় আছে! কেবল মাকুর মত ছুটে বেড়াচ্ছি। যা হোক, আমি বলে যাব, পরশুদিন ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এখানে আসবে। চলে যাবেন চিড়িয়াটাপু। খ্যাপার সঙ্গে দেখা করুন। দেখবেন, বললেই ও রাজী হয়ে

যাবে। আরে ওই তো কাজ, পাগলকে আবার নাচতে বলা। একটু গান-বাজনার গল্প করলেই গলে জল হয়ে যাবে।

—গান-বাজনা কেন? মামাবাবু বললেন।

—লোকটা দারুণ গান-বাজনার ভক্ত। গায়ও চমৎকার। ওর গানের খ্যাতি সারা দ্বীপে। যা ভাটিয়ালি গায় মশায়, কি বলব! হ্যাঁ, পথে করবিন্ কোভ-য়ে নেমে এক কাপ কফি খেয়ে নেবেন।

—করবিন্ কোভ্ কি? সুনন্দ বলে।

—পিকনিক স্পট্। সমুদ্রের ধারে। খাসা জায়গা। রেষ্টুরেণ্ট আছে। ইস্, আমি নিজে যেতে পারছি না। কী ভীষণ যে লজ্জিত তা ভাষায় বোঝাতে পারছি না। আপনারা মেনল্যাণ্ডের লোক। অতিথি। নিজগুণে ক্ষমা করবেন দাদা। কি করি, ব্যবসা করে খাই। দু'দণ্ড শান্তিতে জিরোবার উপায় নেই, দেখছেন তো।

আমরা বললাম, তাতে কি হয়েছে। গাড়ি পাঠাবেন, এই তো যথেষ্ট।

রাত্তিরে সুনন্দ আমায় বলল, কাল একবার চাচার কেবিনে ঢুঁ মারব।

—কেন!

—খোঁজ নেব মকবুলরা এল কি না!

—মকবুলদের জাহাজ তো আজ ছেড়ে গেছে।

—তাতে কি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এল কি না জানতে পারব।

—বুঝেছি। মকবুল না হাতি। তোর আসল উদ্দেশ্য—চাচার কেবিনের কষা মাংস।

সুনন্দ চোখ বুজে, মাথা নেড়ে বলল, আঃ, কি বানায় বল দিকি! রেস্ট হাউসের রাঁধুনীটা বোগাস। দুপুরে ওটা কি রেঁধেছিল? মাংস না সুকতো?

চাচার কেবিনে উঁকি দিতেই চাচা বলে উঠল—এই যে বাবু, কাল আকবর এসেছিল। আপনাদের কথা বলেছি। বলল, এখন সময় নেই, জাহাজ ছাড়বে। পরে দেখা করবে।

—মকবুল আসেনি? সুনন্দ প্রশ্ন করে।

—ঠিক জানি না। আকবর বলল, ও গিয়েছিল সাজিপুর না কোন গ্রামে নেমন্তন্ন খেতে। মকবুল নাকি এখানেই ছিল। বোধহয় জাহাজে ফিরে গিয়েছে। ওর সঙ্গে দেখা হয়নি।

চাচা মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, কিন্তু মকবুল আমার কাছে একটা ছোট কাঠের বাক্স চাইল। বলেছিল ফেরার দিন নিয়ে যাবে। কই, এল না?

যাহোক, যে উদ্দেশ্যে আগমন সেই কষা মাংস ও রুটির অর্ডার দিয়ে বেঞ্চে বসে পড়লাম।

খাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ ভারী গলার আওয়াজ—চাচা, শুনলাম আকবর এসেছিল, আমার টাকা রেখে গেছে?

—না। কিসের টাকা রে রহমন? চাচা শুধায়।

—ধার। পঞ্চাশ টাকা। কসম খেয়ে বলল, মাদ্রাজ থেকে ফিরে ঠিক শোধ করবে। আমার দেখা না পেলে চাচার কাছে রেখে যাবে।

দোকানের একটি ছোকরা খদ্দের ঠাট্টা করে উঠল, ভাল লোককে ধার দিয়েছিস। আর পেয়েছিস ও টাকা। বোধহয় তোর ভয়েই ও গ্রামে গিয়ে লুকিয়েছিল। নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন ডাহা মিথ্যে কথা।

—বেটার ঘাড় ধরে আদায় করে নেব। রহমান গর্জে ওঠে। —কলকাতা থেকে ফিরুক, দেখি ও কত বড় ফেরেব্বাজ।

একটি দার্শনিক খদ্দের বুড়ো এক কোণে বসে বিড়ি টানছিল। বিজ্ঞের মতো মন্তব্য করল, মকবুল ছোকরা এবার জাহান্নমে যাবে।

—কেন? চাচা বলে।

—কেন আবার, আকবরটার সাকরেদি করছে। ওটা এক নম্বর শয়তান। নেশাখোর, জুয়াড়ী। মনে নেই, সেবার কলকাতায় ধরা পড়েছিল চোরাই মাল পাচার করতে গিয়ে? খুব বেঁচে গেছে জেল খাটতে খাটতে। বেটার কেবল বদ মতলব আর টাকার ধান্দা।

মামাবাবুকে মকবুল-আকবর সংবাদ জানাতে তিনি শুধু বললেন, হুঁ, আকবর আলিকে বেশ ঝানু বলে মনে হয়েছিল।

॥ ৫ ॥

আমরা তিনজন রেস্ট হাউসের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি। দাসবাবুর জীপ হাজির। চিড়িয়াটাপু যাব। একটা ট্যাক্সি এসে থামল। ট্যাক্সি থেকে নেমে সুট-টাই পরনে এক ভদ্রলোক গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, হ্যাল্লো, প্রফেসর ঘোষ।

মামাবাবু অবাক হয়ে উত্তর দিলেন, আরে, মিস্টার আয়ার যে। এখানে?

—একটা বিশেষ কাজে মিড্‌ল আন্দামানে এসেছিলাম। আজই ফিরে যাচ্ছি প্লেনে। হঠাৎ মিস্টার দাসের সঙ্গে দেখা। উনি বললেন আপনার কথা।

শুনলাম, আয়ার একজন কফিগাছ বিশেষজ্ঞ। কোন এক কোম্পানি এখানে কফি বাগান করতে চায়। বাগানের উপযুক্ত জায়গা বেছে দেবার জন্য তারা আয়ারকে আনিয়েছে।

মামাবাবু একটু ছুতো করে ঘরে গিয়ে আমাদের বললেন, তোমরা দু'জনেই ঘুরে এস। আমি থাকি—ভদ্রলোক এসেছেন। রসিক মাঝির সঙ্গে আলাপ কর। যদি রাজী থাকে বলবে, আমি বিকেলে যাব প্রোগ্রাম ঠিক করতে। হ্যাঁ, তাহলে ড্রাইভারকে বলো দুপুরে গাড়ি নিয়ে আসতে।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে গাড়ি চলল। দু'পাশে বন, মধ্যে মধ্যে গ্রাম। চমৎকার দৃশ্য। চিড়িয়াটাপু পৌঁছলাম। ড্রাইভার দেখাল,

ঐ খ্যাপার বাড়ি।

সমুদ্রের ধারে নির্জনে ছোট্ট কুঁড়েঘর। নিকষ কালো জোয়ান একটি আধা বয়সী লোক বাড়ির সামনে কাঠ চেলা করছিল। আমরা দু'জন কাছে যেতে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার মাথায় কাঁধ অবধি লম্বা কুচকুচে কালো বাবরি চুল। হাসিমুখে ডাকল। —সেবা দি কত্তা। কি প্রয়োজন?

বললাম, আমরা রসিক মাঝিকে খুঁজছি।

লোকটি হো হো করে হেসে উঠল।—কত্তারা নিশ্চয় বাইরের লোক। নইলে খ্যাপারে রসিক কইবেন ক্যান্? এ-দ্বীপে কেউ কয় না।

বললাম, হ্যাঁ, আমরা কলকাতা থেকে আসছি। তোমাকে দরকার।

—কলকাতা! ও বাব্বাঃ। খ্যাপার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। —বলেন, বলেন।

দাসবাবুর অনুমান ঠিক। ভাল করে শোনার আগেই খ্যাপা রাজী—নিশ্চয় নিশ্চয়। যাব বৈকি। তা কবে যাইবেন, কোথায় কোথায় যাইবেন?

বললাম, আমাদের মামা দুপুরে এসে সে সব ঠিক করবেন।

পাওনার কথা তুলতে সে থামিয়ে দিল।—সে যা হয় দেবেন। তবে একা তো সবটা বাইতে পারব না, আর একটা ছোঁড়ারে সঙ্গে নেব। দু'চার টাকা দিয়ে দেবেন তাকে।

খ্যাপাকে একটু সন্তুষ্ট করতে আমি বললাম, তোমার গানের সুখ্যাতি শুনেছি। শোনাতে হবে একদিন। আহ্লাদে তার সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়ল।

—শুনবেন বৈকি, যখন ইচ্ছে আজ্ঞা করবেন। আপনাদের আনন্দ দিতে পারলে কেতাথ হব। এই দেখেন কত্তা। অতিথ আইলেন, আমি গরিব মানুষ কি দিয়া সেবা করি? একটু চা খান।

—চা?

—আজ্ঞে ঐটি আমার বদভ্যাস। ছ্যাশে থাকতে খেতাম। এখানে বড় মাগ্‌গি, কিনতে পারি না। তবে মকবুল মাঝে মাঝে এলে চা, গুঁড়া দুধ, চিনি নিয়ে আসে। তাই খেতে পাই।

—মকবুল! সাগররাণী জাহাজের খালাসী মকবুল? সুনন্দ আশ্চর্য হয়ে বলে।

—হ্যাঁ কত্তা। আপনারা চেনেন নাকি মকবুলরে?

—চিনি, মানে আলাপ হয়েছিল কলকাতায়, মকবুল আর আকবর সাগরাণীর দু'জন খালাসীর সঙ্গে।

—আকবরকে চিনি না। নাম শুনছি। খ্যাপা বলল। তবে মকবুল প্রায়ই আসে, গান-বাজনা ভালবাসে কি না। এইতো দিন পনেরো আগে কলকাতা থেকে এসেছিল। গল্প-গুজব করল। গান হলো। তারপর আমার জমানো শাঁখ-ঝিনুকগুলো অনেকক্ষণ ধরে দেখল।

—এবার আসেনি মাদ্রাজ থেকে ফিরে? আমি বলি।

—না।

—তুমি শাঁখ জমাও কেন? বিক্রি কর? সুনন্দ প্রশ্ন করে।

—আজ্ঞে না কত্তা, শাঁখ বিক্রি করা আমার পেশা নয়। হাতের কাজ জানি। একটা পেট চলে যায়। শাঁখ জমাই। ঐ দেখেন না, বাক্সটার মধ্যে ভরা রয়েছে।

একটা বেশ বড় কাঠের বাক্সের বুক অবধি ঠাসা অজস্র শাঁখ, ঝিনুক, কড়ি ইত্যাদি নানারকম সামুদ্রিক শেল। তবে কোন যত্ন নেই। গাদাগাদি করে রাখার ফলে তাদের অনেকের রঙ বিবর্ণ। খোলার চটা উঠে গেছে। গায়ে ময়লা লেগে রয়েছে।

আমরা দু'জন কেউই শেল্ বিশেষজ্ঞ নই। বললাম, মামাবাবু এলে দেখিও। তিনি এসব জিনিস ভালই চেনেন। সমজদার লোক।

দুপুরে আমরা আর মামাবাবুর সঙ্গে খ্যাপার কাছে গেলাম না। মামাবাবু বললেন, তোমরা বরং বাজারে যাও। কিছু কেনা-কাটা করে এস। পারলে দিন দুয়েকের মধ্যে বেরিয়ে পড়ব।

মামাবাবু ফিরলেন সন্ধ্যের পর। এসেই ডাক দিলেন, সুনন্দ, অসিত, রেডি হও। কাল ভোর বেলা আমরা খ্যাপার নৌকো করে বেরিয়ে পড়ছি। চার-পাঁচ দিন থাকব। সেই বুঝে খাবার-দাবার, তাঁবু ইত্যাদি যা লাগে গুছিয়ে নাও।

—এত তাড়াতাড়ি? অবাক হয়ে বলি।

—হ্যাঁ। মিছিমিছি সময় নষ্ট করে কি লাভ।

॥ ৬ ॥

খ্যাপার কুটির অবধি আমরা জীপে গেলাম। খ্যাপা প্রস্তুত হয়ে ছিল। দেখলাম, একটি সতের আঠারো বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা, সুন্দর স্বাস্থ্য। খ্যাপা পরিচয় দিল—হ্যালারাম। আমাদের সঙ্গে যাবে। আরও বলল—ইটি আমার শিষ্য, বাজনার হাতটি বড় মিঠা।

গুরুর প্রশংসায় হ্যালারামের কোনো ভাবান্তর হলো না। মুখ নিচু করে গম্ভীর বদনে দাঁড়িয়ে রইল।

খ্যাপার সাম্পানটি ছোট। যা হোক, মালপত্র নিয়ে মোটামুটি আমাদের কুলিয়ে গেল। ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে অনুকূল স্রোতে আমাদের নৌকো ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলল।

চিড়িয়াটাপু থেকে একটু এগোতেই একটা বড় দ্বীপ। মামাবাবু একখানা গুটানো ম্যাপ হাতে বসেছিলেন। ম্যাপ দেখে বললেন —এটা রাটল্যাণ্ড আইল্যাণ্ড। দ্বীপের পাশ কাটিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। এরপর দেখা গেল কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ। কাছা-কাছি। মামাবাবু ম্যাপ দেখে বললেন—সামনেরটা বোধহয় জলি বয় আইল্যাণ্ড। পরেরটা মালয়টাপু।

খ্যাপা বলল—এদিককার দ্বীপগুলোয় বুনমনিষ্যি থাকে না। শুধু প্রথম দ্বীপটায় কিছু বুনো জারোয়া আছে। ভয়ানক হিংস্র। দেখা পেলেই মারতে আসবে।

দ্বীপগুলো দেখতে কিন্তু অপূর্ব সুন্দর। দ্বীপের চারপাশ ঘিরে

চওড়া ফিতের মত শুভ্র বেলাভূমি। তার পিছনে ঘন সবুজ জঙ্গল। কোনটার ভিতরে গাছপালা ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়ের মাথা দেখা যাচ্ছে। তীরের কাছে মাঝে মাঝে প্রবাল প্রাচীরের বেষ্টনী। সাগরের স্রোত ক্রমে আছড়ে পড়ছে তাদের গায়ে। পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা ফেনা ও জলকণা ফোয়ারার মতো লাফিয়ে উঠছে ঊর্ধ্বে। চতুর্দিক নীরব নিস্তব্ধ। কেবল ঢেউয়ের একটানা কলরোল। তীরের কাছে কাছে নানান জাতের সামুদ্রিক পাখি উড়ছে, বসছে, জলে ছোঁ মারছে।

খ্যাপার মেজাজ এসে গেল। আমাদের অনুরোধের অপেক্ষা না রেখেই গলা ছাড়ল—ওরে অকূল দরিয়া—

বাঃ চমৎকার গলা। দরাজ, উদাত্ত কিন্তু মিষ্টি।

হালারামের মতো কম কথার মানুষ আর দেখিনি। এ পর্যন্ত একটিও আস্ত বাক্য বলেনি। স্রেফ হুঁ-হাঁ করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সঙ্গীতরসিক সন্দেহ নেই। দেখলাম খ্যাপার গানের সাথে তালে তালে মাথা ঝাঁকাচ্ছে।

খ্যাপা পর পর তিনখানা গাইল। ইতিমধ্যে মালয়টাপু ছাড়িয়ে গেছি। হঠাৎ খ্যাপা সামনে আঙুল দেখিয়ে বলল, কর্তা আইয়া পড়ছি। ঐ দ্বীপ।

মামাবাবু ম্যাপ দেখে জানালেন, খুব সম্ভব এটার নাম রেডস্কিন আইল্যাণ্ড। আমরা ওখানে নামব।

দ্বীপে পা দিয়েই মামাবাবু বললেন, তোমরা রান্না কর, আমি খানিক ঘুরে আসছি। তিনি বনের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

তীরের কাছে একটা গাছের তলায় একে একে সব মালপত্র এনে জড়ো করলাম। নৌকোটা টেনে বালিতে তোলা হলো। সুনন্দ রন্ধন-বিশারদ। রান্নার দায়িত্ব তার। বলল, এবেলা খিচুড়ি হোক। সঙ্গে আচার।

তথাস্তু—। সূর্য মাথার ওপর। সবারই পেট চন্‌চন্ করছে খিদেয়। সুনন্দ খ্যাপাকে বলল, তিনটে বড় বড় পাথর চাই,

উনুন বানাব।—আর শুকনো কাঠ।

খ্যাপা হ্যালারামকে বলল, হ্যালা, তুই পাথর আর কাঠের জোগাড় দে, আমি একটু ঘুরে আসি।

—কোথায় চললে খ্যাপা?

—আজ্ঞে, দেখি কচ্ছপের ডিম পাই কি না। বালিতে লুকনো থাকে, দেখলেই চিনতে পারব। খ্যাপা সমুদ্রের ধারে ধারে হেঁটে চোখের আড়ালে চলে গেল।

উনুন তৈরি। হ্যালারাম একটা দুটো করে শুকনো ডাল নিয়ে আসছে। আমি ও সুনন্দ চাল ডাল ধুচ্ছি। আমাদের সঙ্গে একটিন পানীয় জল আছে। আপাততঃ তাতেই রান্না চড়াই. পরে খুঁজে দেখব দ্বীপে পানীয় জল আছে কি না। হঠাৎ কানে এল আর্তনাদ—বাঁচাও বাঁচাও।

আমরা হতভম্ভ হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। কি ব্যাপার? খ্যাপার কণ্ঠস্বর মনে হলো। তারপরই শুনলাম, ধুপধাপ পদশব্দ, কাছেই। কেউ যেন দৌড়ে আসছে।

আমাদের ডানপাশে একটা ঘন ঝোপ। হঠাৎ খ্যাপা তীরবেগে ঝোপের পাশ দিয়ে দৌড়ে এসে আমাদের ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরেও দুই মূর্তির আবির্ভাব। তারাও সমান জোরে দৌড়চ্ছে। সামনের লোকটার হাতে খোলা ছুরি। রোদে চকচক করে উঠল লম্বা ফলাটা।

গাছের আড়ালে আমাদের দু'জনকে তারা দেখতে পায়নি। মুহূর্তে তারা আমাদের পাশে এসে পড়ল। তৎক্ষণাৎ সুনন্দ মারল লাফ—ডাইভ। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে পাকা গোলকিপারের কায়দায়। দেখলাম, সে বলের বদলে দৃঢ়মুষ্টিতে ছুরি-হাতে লোকটার কোমর আঁকড়ে ধরল এবং দড়াম্ করে দু'জনে আছড়ে পড়ল মাটিতে, সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দ এক মোচড়ে লোকটার হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিয়ে তার বুকে চড়ে বসল। তারপরই দুটো মোক্ষম ঘুষি। সে ছুরিটা উঁচিয়ে ধরল লোকটার বুকের ওপর।

ব্যস, লড়াই খতম। বুকের ওপর সাক্ষাৎ মৃত্যুকে উদ্যত দেখে লোকটা আর নড়ার চেষ্টা মাত্র করল না।

দ্বিতীয় লোকটা প্রথমে একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, এবার সে সঙ্গীর সাহায্যে এগোল। অমনি আমিও এগোলাম তাকে লক্ষ্য করে—রান্নার লোহার খুন্তিখানা বাগিয়ে।

লোকটা অত্যন্ত চালাক এবং চটপটে। অবস্থা বেগতিক বুঝে সে তৎক্ষণাৎ পশ্চাদপসরণ করল। এক দৌড়ে নিমেষে মিলিয়ে গেল বনের অন্তরালে।

ইতিমধ্যে খ্যাপা ফিরে এসেছে। হালারামও ছুটে আসছে। আমরা না আটকালে খ্যাপা হয়তো দাঁড় দিয়ে পিটিয়ে লোকটাকে মেরেই ফেলত।

লোকটার হাত-পা বেঁধে মাটিতে ফেলে রেখে আমরা খ্যাপাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার, কে এরা ?

—চোর, খুনে। হাড়-বজ্জাত। খ্যাপা রাগে ফুঁসছে।

—চোর ?

—হ্যাঁ, সিপি চোর। ট্যাকসো ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ধরে।

—সিপি কি ? সুনন্দ বলে।

—কথাটা আমি জানি। বললাম, এক জাতীয় শেল্। আন্দামানের সমুদ্রে পাওয়া যায়। দেখতে অনেকটা শাঁখের মত। এখানে বলে সিপি। আমি বইয়ে পড়েছি।

—হ-হ ঠিক কইছেন। খ্যাপা আমায় সমর্থন জানায়। একরকম শাঁখ। এই শাঁখ বেশ চড়া দামে বিকোয়। ওর খোলা দিয়ে বাতিদান, কানের দুল এই সব অনেক কিছু বানানো হয়। সিপি চালানের ওপর গবরমেন্ট ট্যাক্সো বসিয়েছে।

আমি প্রশ্ন করি—তা তোমার সঙ্গে এর ঝগড়া বাধল কি করে ?

খ্যাপা বলে, এক জায়গায় বসেছিল। আমি যেতেই বলে কিনা—ভাগো। আমি বললাম, কেন যাব হে ? তোমাদের কেনা দ্বীপ ? চোর কোথাকার। অমনি ছুরি খুলে তেড়ে এল।

—এরা এসেছে কোত্থেকে ?

—বর্মা মুল্লুক। প্রত্যেকব ছর আসে।

লোকটার চেহারা দেখে বর্মী বলেই মনে হলো।

খ্যাপা বলল, এ লোকটার নাম মংপো। ভীষণ শয়তান, দাঙ্গাবাজ। কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে ওর একচোট হয়ে গেছে।

—কি রকম ?

—অন্য এক দ্বীপে ও বেটা শাঁখ ধরছিল। আমি বেড়াতে-বেড়াতে সেখানে গেছি। অমনি তেড়ে এসেছে। ওর ধারণা, আমারও বুঝি ওদের মতো লুকিয়ে শাঁখ ধরা পেশা। সেবার ও একা ছিল, তাই সুবিধা করতে পারেনি। এবার দলে ভারি, তাই খুব তেজ।

—দল ? সুনন্দ বলে। ক'জন ছিল ?

—তিনজন।

—চল তো দেখে আসি। সুনন্দ উঠল। হ্যালারাম, তুমি একে পাহারা দাও।

হ্যালা কোন কথা না বলে নৌকোর দাঁড়খানা বাগিয়ে ধরে মংপোর মাথার কাছে খাড়া হলো।

বাঁশের টুকরো। ভাঙ্গা ডাল ইত্যাদি হাতিয়ার নিয়ে আমরা চললাম। মংপোর ছুরিটা অবশ্য এখন সুনন্দের দখলে।

একটু দূরে যেতেই ছুটো লোককে দেখলাম। জলের পাশে বালির ওপর বসে তারা কি জানি করছে। আমাদের দেখা মাত্র তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে হাওয়া হয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখি বড় থলির মধ্যে কিছু শাঁখ আর ঝিনুক। পাশে আরও একগাদা বালির ওপর জড়ো করা রয়েছে। থলির মধ্যে সব ভরে নিয়ে আমরা ফিরে এলাম।

ঠিক হলো, মংপো যেমন আছে পড়ে থাক। মামাবাবু ফিরে এসে যা হয় বিচার করবেন। আপাততঃ রান্না চড়াই। বন্দী শুয়ে শুয়ে জুল জুল চোখে আমাদের লক্ষ্য করতে লাগল।

মামাবাবু ফিরে এসে থ।—এ কি!

আমরা সমস্ত ঘটনা বললাম।

—হুঁ, তাই একটা খালি নৌকো দেখলাম ও পাশে। ভাবছিলাম কাদের নৌকো। মামাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। শাঁখগুলো নেড়েচেড়ে দেখলেন। তারপর বন্দী মংপোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন—ক'দিন এসেছ এ দ্বীপে?

—আজ সকালে।

—মিথ্যে কথা। মামাবাবু ধমকে ওঠেন। অতগুলো একবেলায় পেয়েছ? তোমায় পুলিশে দেব।

মার খেয়ে যত না কাবু হয়েছিল, পুলিশের নামে দেখলাম তার একেবারে ধাত ছেড়ে গেল। কাঁইমাই করে বিকট স্বরে অনুনয় বিনয় শুরু করে দিল।

—সত্যি কথা বল। তাহলে ছেড়ে দিতে পারি। নইলে—মামাবাবু কঠিন স্বরে বললেন।

—আজ্ঞে পাঁচদিন এসেছি। মংপো স্বীকার করে। লোকটা হিন্দী বোঝে। প্রশ্ন-উত্তর হিন্দীতেই হচ্ছিল।

—তখন আর কেউ ছিল এ দ্বীপে? মামাবাবু জিজ্ঞেস করেন।

—হ্যাঁ।

—ক'জন?

—দু'জন।

—ঠিক করে বল। মামাবাবুর স্বর কঠোর হয়ে ওঠে।

—আজ্ঞে সত্যি বলছি। দিব্বি গালছি।

—একজন লম্বা, কপালে কালো আঁচিল? আর একজন বেঁটে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক।

—তারা কোথায়?

—চলে গেছে দ্বীপ ছেড়ে।

—কোন দিকে?

—ঐ দিকে। লোকটা দক্ষিণ দিকে ইশারায় দেখায়। বোধ

হয় পরের দ্বীপটায়।

—হুঁম। মামাবাবু ঘাড় নিচু করে কি জানি ভাবলেন। বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে। তারপর মুখ তুলে বললেন—যাক, এ লোকটাকে এবার ছেড়ে দাও। ওর শেল্‌গুলোও দিয়ে দাও। —তোমরা এক্ষুনি দ্বীপ ছেড়ে চলে যাও। ঐ দিকে যাবে। মামাবাবু আঙুল দিয়ে উত্তর দিক দেখালেন।

বামাল সমেত মুক্তি লাভ করে মংপো তো চাঁদ হাতে পেল। খুব খানিকটা কৃতজ্ঞতা জানাল। তারপর হনহন করে হাঁটা দিল। মাঝে মাঝে আবার পিছন ফিরে চায়। যেন ভয়, এই বুঝি আমরা মত বদলাই। কিছু দূর গিয়ে এক ছুট।

—কারা এসেছিল? আমি অবাক হয়ে বলি। মকবুল তার আকবর নাকি?

—হ্যাঁ। আমার ধারণা দেখছি ভুল। মকবুল একা নয়, দু'জনেই এসেছিল।

সুনন্দ বলে, আপনি বুঝলেন কি করে মকবুল এসেছিল?

—আন্দাজ করেছি। কারণ কলকাতা থেকে ফিরে মকবুল খ্যাপার কাছে যায়। তার জমানো সী-শেলগুলো দেখে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে, কিন্তু যা খুঁজছিল তা পায়নি। খ্যাপা ওকে এই দ্বীপের কথা বলে। বলে, অনেকরকম শাঁখ এখানে পাওয়া যায়।

আমরা বুঝতে পারি, কেন মামাবাবু বেছে বেছে এইখানে হাজির হয়েছেন। মকবুলের সন্ধানে।

আমার মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরছিল। বললাম—আচ্ছা, দু'জনেই একসঙ্গে এসেছিল, তারপর আকবর জাহাজে ফিরেছে, কিন্তু মকবুল ফেরেনি। সে গেল কোথায়?

—সেটা আমিও ভাবছি। মামাবাবু বলেন।

সুনন্দ বলল, আকবর যে চরিত্রের লোক, যদি সত্যি ওরা কোনো দামী শেল্ পেয়ে থাকে, তাহলে সে মকবুলকে খুন করে শেল্ নিয়ে পালাতে পারে।

—অসম্ভব নয়। মামাবাবু সায় দেন।

দক্ষিণ দিগন্তে সাগরবক্ষে একটা দ্বীপের আবছা কালো রেখা দেখা যাচ্ছিল। মামাবাবু সেটা দেখিয়ে খ্যাপাকে বললেন, এখুনি রওনা দিলে ওখানে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে বল তো।

—তা কত্তা, সন্ধ্যা লেগে যাবে। এখন ভাঁটার সময়। অন্ধকারে জঙ্গলে ঢোকা উচিত হবে না। বিষাক্ত সাপ আছে বনে।

—বেশ, কাল ভোরেই যাওয়া যাবে। সময় নষ্ট না করতে পারলেই ভাল হতো, উপায় কি। যাক্, ক্ষিদে পেয়েছে। সুনন্দ, রান্নার কতদূর ?

আমরা পাত পেড়ে খেতে বসে গেলাম।

খাওয়া-দাওয়া সেরে খ্যাপা বলল, যাই ডিম খুঁজে আনি। তখন তো চোরগুলোর জ্বালায় খোঁজাই হলো না।

ঘণ্টা দুই পরে সে ফিরল। এক হাতে থলি ভরা পঞ্চাশ-ষাটটা কচ্ছপের ডিম। অন্য হাতে জ্যান্ত এক কচ্ছপ। হাতের তেলোয় চিৎ করে নিয়ে আসছে।

খ্যাপা জানাল, বর্মীগুলোর নৌকো নেই। অর্থাৎ পালিয়েছে।

রাতে পরম তৃপ্তিভরে সবাই ভাত, কচ্ছপের মাংসের ঝোল ও কচ্ছপের ডিমের অমলেট খেলাম। সমুদ্রের হাওয়ায় খিদে বাড়ে। তাছাড়া বিকেলে দ্বীপের বনে ও সমুদ্রতীরে কম ঘুরিনি। প্রত্যেকে বেশ বেশিই খেলাম। কিন্তু হ্যালারাম নীরব নতমুখে হুস্‌হাস্ শব্দে যে পরিমাণ উদরস্থ করল তা দেখবার মত।

আমাদের শোবার ব্যবস্থা খুব সহজ। তিনটে হ্যামক্ অর্থাৎ দোলনা-বিছানা নিচু নিচু গাছের ডালে টাঙ্গিয়ে নিলাম। খ্যাপা ও হ্যালারাম নৌকোর মধ্যে শুলো। এখানে হিংস্র জানোয়ারের ভয় নেই।

শুক্লপক্ষের রাত। আকাশের এক কোণে গোলাকার রূপার থালার মতো চাঁদ। মাথার ওপর নির্মেঘ উদার আকাশ।

হালকা জ্যোৎস্নায় বহুদূর অবধি পরিষ্কার দেখা যায়। ঢেউ-এর

পর ঢেউ শুভ্র ফেনার মুকুট পরে নাচতে নাচতে অবিরাম ছুটে আসছে। ঝাঁপিয়ে পড়ছে তীরে। জলের অবিশ্রান্ত কলরোল শুনতে শুনতে, জোরালো ঠাণ্ডা হাওয়ায় আরামে অল্পক্ষণেই চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে।

॥ ৭ ॥

নৌকো একটা খাঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে আমরা ডাঙ্গায় উঠলাম। ব্যাগ-ট্যাগ জাতীয় হাল্‌কা জিনিস কাঁধে নিলাম। ভারি মাল সব নৌকোতেই রইল। মামাবাবু বললেন, প্রথমে জলের ধারে ধারে দ্বীপটাতে ঘুরি। বেশি কথা বলো না। সবাই সজাগ হয়ে নজর রাখবে চারদিকে।

এ দ্বীপটি নেহাৎ ছোট। চারপাশ ঘুরে আসতে আমাদের ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় লাগল না। তীরে কোনো মানুষের চিহ্ন দেখতে পাইনি। মামাবাবু নির্দেশ দিলেন—এবার ভিতরের দিকে চল।

নারকেল গাছের সারির পরই শিমুল, গর্জন ইত্যাদি গাছের জঙ্গল। তবে বন খুব ঘন নয়। মোটা মোটা লতা পাকে পাকে গাছের গুঁড়িকে জড়িয়ে উপরে উঠে গেছে। লতার ডগাগুলো দুলছে। তাতে গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা ফুল। মিষ্টি গন্ধ ভাসছে বাতাসে। শুকনো ঝরা পাতার ওপর দিয়ে মচমচ পায়ের শব্দ তুলে আমরা এগোই। চতুর্দিক নীরব নিস্তব্ধ। শুধু নানারকম প্রাকৃতিক ধ্বনি কানে আসে। দূরে সাগরের কলরোল। নারকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস ছুটছে। জীবন্ত প্রাণীর গলা শুনছি কেবল পাখির। সামুদ্রিক পাখিদের তীক্ষ্ণ স্বর। ঝোপের মধ্যে নানারকম পাখ-পাখালির কাকলি। মানুষের আবির্ভাবে চমকে উড়ে পালাচ্ছে কেউ কেউ।

আমরা নীরবে চলেছি। এ-বনে এ-দ্বীপে মানুষের পদধূলি কখনো পড়েছে কিনা সন্দেহ।

পথে একটা ছোট্ট ডোবা পড়ল। জল প্রায় নেই, শুধু কাদা। ডোবার চারধারে ম্যানগ্রোভ গাছের ঘন বন। তাদের শিকড় বল্লমের মতো মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে। পায়ে ফুটে যেতে পারে। তাই একটু দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাই।

দ্বীপের প্রায় মাঝখানে এক উঁচু পাথরের টিলা। চার পাশে বড় গাছ খুব কম, নরম মাটি প্রায় নেই। কেবল পাথর, ছোট ছোট আগাছা আর ঘাস জন্মেছে পাথরের খাঁজে খাঁজে।

হঠাৎ খ্যাপা বলল—ঐ দেখুন।

পাথরের টুকরো সাজানো একটা উনুনের চিহ্ন এবং তার মধ্যে কিছু কাঠকয়লা। খ্যাপা কাঠকয়লা হাতে নিয়ে বলল, উঁহু, বেশি পুরনো নয়। দু'চার দিনের মধ্যে কেউ রান্না করেছে।

আরও কোনো চিহ্নের আশায় তাকাচ্ছি, মামাবাবু বললেন, ঐ গুহাটার সামনে দেখ।

খাড়া পাহাড়টার তলায় অনেক ছোট বড় গর্ত বা গুহা রয়েছে। মামাবাবু কোনটার কথা বলছেন ?

মামাবাবু দ্রুতপায়ে গিয়ে একটা গুহার মুখে দাঁড়ালেন ও মাটি থেকে এক টুকরো কাঠকয়লা তুলে নিলেন। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন আমাদের দিকে।, তারপর গুহার মধ্যে মুখ বাড়ালেন।

দেখলাম, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তিনি তাকিয়ে আছেন। যেন কিছু দেখতে পেয়েছেন। আমরাও নিঃশব্দে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

গুহার মুখ প্রশস্ত নয়। তবে ভিতরে অনেকখানি জায়গা। মাটিতে একটি শায়িত দেহ, মানুষের বলেই মনে হলো। নীরব নিস্পন্দ। তার মাথা গুহামুখের দিকে। চিৎ হয়ে আছে। মাথাটা একটু পাশে হেলানো। চিবুক অবধি আগাগোড়া চাদরজাতীয় কোনো আচ্ছাদনে ঢাকা রয়েছে। শুধু মাথার কালো চুল দেখতে পাচ্ছি। নাকমুখের কিছুটা অংশ খোলা কিন্তু তা থেকে তার পরিচয় বুঝতে পারলাম না।

মামাবাবু চাপা স্বরে সুনন্দকে বললেন, দেখি টর্চটা। সুনন্দ

ব্যাগের মধ্যে থেকে টর্চ বের করে দিল। টর্চের আলো পড়তেই লোকটির কপালে ডুমুরের মত বড় কালো আঁচিলটা আমাদের চোখে পড়ল। মকবুল! কিন্তু জীবিত না মৃত?

না, প্রাণ আছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে বুকের মৃদু ওঠানামা দেখতে পাচ্ছি। টর্চের আলো মুখে পড়তেও সে নড়ল না।

মামাবাবু ডাকলেন, মকবুল, মকবুল।

দেহ নড়ে উঠল। ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল—কে, আকবর?

—না, আকবর নয়। আমরা। মামাবাবু বলেন।

—কে! মকবুল ঘাড় কাত করে দেখার চেষ্টা করে। গুহার সামনে কয়েকজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে ধড়মড় করে উঠে বসে। হাত বাড়িয়ে পাশে রাখা একটা কি জানি তুলে নেয়। টর্চের আলোয় দেখি একটা বড় ধারালো কাটারি সে বাঁ হাতে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে আছে। তার চুল উস্‌কোখুস্‌কো। দৃষ্টি লালচে।

মামাবাবু আবার বলেন, আমাদের চিনতে পারছ না মকবুল? ভয় নেই, আমরা তোমার অনিষ্ট করতে আসিনি।

পিছন থেকে খ্যাপার গলা শোনা যায়—মকবুলরে, আমরা, আমি খ্যাপা।

অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকায় এবং তারপর হঠাৎ আলোর দিকে চাইতে মকবুলের বোধহয় দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়েছিল, চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল। খ্যাপার গলা পেয়ে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—ও, খ্যাপা! আমাদের সে চিনতে পারে।—আপনারা এখানে?

মামাবাবু বললেন, তুমি অসুস্থ নাকি? অমন করে শুয়ে আছ?

মকবুল তার কথার জবাব দেয় না। প্রশ্ন করে—আমার ঠিকানা কে দিল? আকবর?

—মোটেই না। মামাবাবু উত্তর দেন। সে বরং বলেছে, তোমার খবর সে জানে না।

—আকবরের দেখা পেয়েছেন আপনি?

—না, দেখা হয়নি। শুনেছি, সে কলকাতা চলে গেছে।

—শয়তান!—মকবুল দাঁতে দাঁত চেপে ক্রুদ্ধস্বরে উচ্চারণ করে।—বিশ্বাসঘাতক!

—কি শাঁখ পেয়েছিলে? খুব দামী কিছু নাকি? মনে হচ্ছে আকবর তোমায় ফাঁকি দিয়েছে?

মামাবাবুর কথায় মকবুল চমকে ওঠে।—শাঁখ! আপনি জানলেন কি করে?

—আন্দাজ করছি। আর আকবর সেই শাঁখ হাতিয়ে তোমায় ফেলে পালিয়েছে। কি? ঠিক বলছি? যাক্, কি পেয়েছিলে শুনি?

মকবুল কিছুক্ষণ চুপ করে ধুঁকতে থাকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—পেয়েছিলাম কী জানেন? সেই যে যার ছবি দেখেছিলাম! যার দাম বলেছিলেন, হাজার হাজার টাকা। কি জানি নাম বলেছিলেন—

মামাবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন—সাগর-গৌরব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু, সাগর-গৌরব। মনে পড়েছে।

—তোমার ভুল হয়নি? উত্তেজনায় মামাবাবুর গলা কাঁপছিল। মনে আছে রঙটা?

—হ্যাঁ বাবু, ঠিক মনে আছে। অত দাম শুনে সেদিন ভাল করে ছবি দেখেছি। অবিকল সেই জিনিস। উঃ, আধাআধি বখরার কথা ছিল, কিন্তু ঐ লোভীটার সহ্য হলো না।

রাগে-দুঃখে মকবুলের চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। বিড়বিড় করে—একবার ফিরে যাই। আকবর আলি, এর বদলা আমি নেব।

মকবুল বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কেমন ক্লান্ত ভাবে গুহার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে। বলল—ওঃ, একটু জল! জলের বোতলটা তার হাতে দিতে অনেকখানি জল খেল।—আঃ!

—শাঁখটা কোথায় পেয়েছিলে? এই দ্বীপে? মামাবাবু জিজ্ঞেস করেন।

—না। আগের দ্বীপটায়।

—ক'টা?

—মাত্র একটা।

—জীবন্ত?

—হ্যাঁ, জ্যান্ত শাঁখ। তারপর দু'দিন তন্নতন্ন করে খুঁজে আর একটা পাই। কিন্তু সে শাঁখটা ভাঙ্গা, বালির ভিতর খোলটা পড়েছিল। তারপর বর্মীগুলো এসে পড়ল। মহা হাঙ্গামা জুড়ে দিল। তখন চলে এলাম এ দ্বীপে।

—ভাঙ্গা খোলাটা আছে, না আকবর নিয়ে গেছে?

—আছে।

—কই, দেখি।

পাশে একটা থলি পড়েছিল। মকবুল হাত ঢুকিয়ে তার মধ্য থেকে শাঁখটা বের করে মামাবাবুর হাতে দিল।

ইঞ্চি চারেক লম্বা। প্রায় আধখানা ভাঙ্গা। গায়ের রঙ হালকা হলুদ। তার ওপরে খয়েরি দাগের অসংখ্য ছোট ছোট ত্রিভুজ।

মামাবাবু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শাঁখটা দেখলেন। তারপর বললেন, আকবর যেটা নিয়ে গেছে, সেটাও কি ঠিক এই জাতের?

—হ্যাঁ, এই জিনিস। তবে রঙ আরও পরিষ্কার ঝকঝকে।

মামাবাবু ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন—মকবুল, তোমার ভুল হয়েছে। সাগর-গৌরব নয়। এ জিনিস আন্দামান অঞ্চলে যদিও সহজে মেলে না, কিন্তু ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে প্রচুর পাওয়া যায়। দাম পাঁচ-দশ টাকার বেশি হবে না। এর নাম টেক্সটাইল-কোন্।

—এঁ্যা! মকবুলের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

—তোমার দোষ নেই। মামাবাবু বললেন—দুটো প্রায় এক-রকমই দেখতে। সাধারণ লোকের ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তবে দামের বিচারে দুটোর আকাশ-পাতাল তফাত।

মকবুল একটুক্ষণ গুম মেরে রইল। তারপর সোজা হয়ে বসে প্রলাপের মত বকতে লাগল—ঠিক হয়েছে। বড়লোক

হবি? বন্ধুকে ঠকিয়ে টাকা মেরে দিয়ে ফুর্তি করবি? এবার বেচতে গিয়ে যখন শুনবি কোথায় হাজার হাজার টাকা। ও মালের দাম পাঁচ-দশ, ব্যস্। কথা ক'টা জোরে জোরে উচ্চারণ করে মকবুল পাগলের মতো হা-হা করে হেসে উঠল। তারপরই গুহার গায়ে অবসন্নের মত এলিয়ে পড়ল।

—হ্যাঁরে মকবুল, তোকে কি রকম যেন দেখাচ্ছে। নিশ্চয়ই তোর শরীর ভাল নাই। খ্যাপা বলতে বলতে কাছে গিয়ে তার কপালে হাত দিল—একি! গা যে পুড়ে যাচ্ছে! খুব জ্বর! শুয়ে পড়, শুয়ে পড়। সে মকবুলকে ধরে শোয়ানোর চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে মকবুল কাতরকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল।

—কি হলো? ব্যথা লাগল নাকি? খ্যাপা অবাক হয়ে বলে।

—হ্যাঁ, এই হাতটা। মকবুল তার ডান হাতখানা দেখাল।

—কি হয়েছে?

—হুল ফুটিয়ে দিয়েছে রে। উঃ কি ভীষণ ব্যথা! মকবুল ডান হাতের ওপর থেকে চাদর সরাল।

দেখলাম, হাতের কবজি অবধি লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। আঙুলগুলো কলার মত ফুলে গেছে। শক্ত, বাঁকাতে পারছে না।

—একি! এ যে সেপ্‌টিক হয়ে গেছে। কিসে কামড়েছে? আমি আতংকিত হয়ে বললাম।

মামাবাবুও এগিয়ে এসে টর্চ ফেলে তার হাত দেখলেন। গায়ে হাত দিয়ে জ্বর পরীক্ষা করলেন।—হুঁ, সেপটিক্। কি কামড়েছে?

—জানি না বাবু! জানি না, কী কামড়েছে। শাঁখ খুঁজতে গিয়ে একটা গর্তের মধ্যে ওই রকম একটা শাঁখ দেখে ধরবার জন্যে হাত ঢুকালাম, আর—উঃ!

—কখন হলো এটা?

—তখন আকবর পালিয়েছে। আমি তখন এখানে একা। শাঁখের নেশা লেগেছে আমার···সাগর-গৌরব···হাজার হাজার টাকা···আল্লায় দিল শাস্তি তাই···মকবুল দম নেবার জন্য একটু

থামল। তারপর বলে চলল—সারা হাতখানা অবশ হয়ে গেল! গুহায় ফিরে এলাম···চুন দিলাম হাতে···কাজ হলো না···হাত ফুলে উঠল···জ্বর এলো···ভাবলাম বুঝি আর বাঁচব না···এখন আপনাদের দেখে আশা হলো ··ওঃ, আরেকটু জল!

খ্যাপা তাকে জলের বোতল দিল।—ছি ছি, আমায় বললেই তো পারতিস। নৌকা করে নিজে তোরে নিয়া আসতাম। একটা বদলোকের সঙ্গে জুটে কি নাকালটাই না হইলি বল দিকি? তা হাতের কথা এতক্ষণ বলিস্‌নি কেন? খ্যাপা তিরস্কার করে।

আমাদের গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ দেশে মকবুলের বোধহয় সত্যি প্রাণের ভয় জন্মাল। হাউ-হাউ করে চিৎকার করে উঠল—আমায় বাঁচান বাবু! আমি বাঁচব তো?

—নিশ্চয়! মামাবাবু বললেন। কোনো ভয় নেই তোমার। আর দু'এক দিন দেরি হলে অবশ্য মুশকিল হতো। যাহোক, এখন তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে চিকিৎসা করালেই সুস্থ হয়ে যাবে। খ্যাপা, ওর মুখ চোখ ঠাণ্ডা জলে মুছিয়ে দাও।

খ্যাপা যত্ন করে গামছা ভিজিয়ে মকবুলের মুখ মুছিয়ে দিল। মনে হলো সে একটু আরাম পেয়েছে।

—মকবুল, তোমায় একটু কষ্ট করতে হবে। যেখানে কামড়টা খেয়েছিলে, সেখানে আমাদের একটু নিয়ে চল। হেঁটে যেতে পারবে, না তোমায় আমরা বয়ে নিয়ে যাব?—মামাবাবুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে আমরা চমকে উঠি।

এ কি অদ্ভুত খেয়াল! অসুস্থ লোকটাকে অদ্দূর হাঁটাবে? একটা তুচ্ছ অতি সাধারণ শেল্-এর জন্য?

সুনন্দ মৃদু আপত্তি জানাল।—মামাবাবু, কি দরকার?

—দরকার আছে।

—ওখানে গিয়ে কি কোনো লাভ আছে?—আমি বাধা দেবার শেষ চেষ্টা করলাম।

—কী মকবুল, পারবে উঠতে? বুঝলাম তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আমার আপত্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন মামাবাবু।

—পারব। উঠছি বাবু। মকবুল হতাশস্বরে বলল। সে যেন নিঃশেষে নিজেকে আমাদের হাতে সঁপে দিয়েছে। নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোন জোরই আর নেই।

খ্যাপার কাঁধে ভর দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। তাকে ধরে গুহার বাইরে এল। খ্যাপা তার কোমর সাবধানে জড়িয়ে ধরেছিল।

খ্যাপা ও মকবুল জড়াজড়ি করে ধীরে ধীরে সামনে চলল। পিছনে পিছনে আমরা চলেছি হতবুদ্ধির মত। আমার মনে মনে ভীষণ রাগ হচ্ছিল। স্রেফ বৈজ্ঞানিক খামখেয়ালিপনা। বড্ড একরোখা হয় এই সায়ান্টিস্টরা। মিছি মিছি লোকটাকে কষ্ট দিচ্ছেন। এখন যত তাড়া-তাড়ি ফেরা যায় ততই মঙ্গল। শেষে জ্বর না আরও বেড়ে যায়। তাহলে ওকে বাঁচানোই মুস্কিল হবে। এতখানি পথ ফিরতে হবে।

॥ ৮ ॥

সমুদ্রের ধারে পৌঁছে মকবুল দেখাল—ঐ পাথরখানা। সবচেয়ে বড় যেটা তার নিচে যে ফাটলটা, সেইখানে।

মামাবাবু বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর। আমি আসছি। তিনি ব্যাগ থেকে এক জোড়া চামড়ার দস্তানা বের করে হাতে পরলেন। খ্যাপা মকবুলকে বালিতে বসিয়ে দিয়ে নিজেও পাশে বসে তাকে ধরে রাখল।

প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে যেখানটা মকবুল দেখিয়েছিল, সে জায়গায় অনেকগুলো ছোট-বড় পাথর পড়ে ছিল বালির ওপর। সাগরের ঢেউ তীরে ভেঙ্গে গড়িয়ে গড়িয়ে এসে ঝাপটা মারছিল পাথরগুলোর গায়ে।

মামাবাবু মাঝের বড় পাথরটার পাশে উবু হয়ে বসলেন। হামাগুড়ি দিয়ে চারধার ঘুরতে লাগলেন। তিনি স্থির হয়ে গেলেন। এক দৃষ্টিতে কি জানি দেখতে লাগলেন। সন্তর্পণে তিনি হাত বাড়ালেন। ফাটলের ভিতর থেকে যখন হাত বের

করে আনলেন, দেখলাম আঙুলে ধরা রয়েছে একটি শঙ্খ। তিনি কিছুক্ষণ গভীর মনোযোগ সহকারে শাঁখটি পরীক্ষা করলেন। তারপর ধীর পদক্ষেপে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

—সুনন্দ, অসিত!—মামাবাবুর এ কণ্ঠস্বর এর আগে আমরা শুনিনি।—দেখ—এই হচ্ছে আসল কোনাস্-গ্লোরিয়া-মারিস্। যাকে বলা হয় 'সাগর-গৌরব'। পৃথিবীর দুর্লভতম সামুদ্রিক শেল।

—এ্যাঁ! আমি ও সুনন্দ এক ছুটে তাঁর সামনে হাজির। মামাবাবু শাঁখটি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

সুনন্দ মাথাটা বোধহয় বেশি কাছে নিয়ে গিয়েছিল। মামাবাবু ধমকে ওঠেন। উঁহু, সরে যাও, সরে যাও! অত কাছে না। ভীষণ বিষাক্ত হুল এই শাঁখের! মকবুলের অবস্থা দেখেছ তো! টেক্সটাইল-কোন্ নির্বিষ! কিন্তু সাগর-গৌরব অতি বিষধর। তাই তো আমার সন্দেহ হলো।

আমরা একেবারে থ! এই অপূর্ব সুন্দর শাঁখ তার হুল ফুটিয়ে মকবুলের এই দশা করেছে! আমরা না এসে পড়লে লোকটা হয়তো মরেও যেতে পারত। আর তার মৃত্যুর কারণ হতো পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ, সবচেয়ে দামী একটি ছয় ইঞ্চি লম্বা শাঁখের বিষাক্ত মারাত্মক হুল।

কিন্তু শাঁখটা অপূর্ব! মুগ্ধ হয়ে দেখি। কি রঙের বাহার! আকার মোচাকৃতি। না না, যেন প্রকাণ্ড এক প্রস্ফুটিত গোলাপের কুঁড়ি! গায়ের রঙ হাতির দাঁতের মতন সাদা। কাঁচের মত মসৃণ চকচকে, আলো পড়ে যেন পিছলে যাচ্ছে। সারা গায়ে সাদার ওপর গাঢ় হলুদ ও বাদামী রেখার ছোট ছোট অসংখ্য ত্রিভুজ আঁকা। মোটা কমলা রঙের তিনটি দাগ শাঁখের দেহকে চক্রাকারে ঘিরে রয়েছে।

মামাবাবু বললেন, এ পাশ থেকে আলোয় দেখ। একটু হাল্‌কা গোলাপী আভা ফুটে বেরচ্ছে না? কি দেখতে পাচ্ছ?

শাঁখটা প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা। প্রকৃতি-রাজ্যের একটি অতি

নিপুণ শিল্পকর্ম। খোলের ভিতর লুকনো কোমল দেহের নিচের অংশ দেখা যাচ্ছিল। আর সূঁচলো মুখের কিছুটা।

শাঁখটি পরম যত্নে দেখতে দেখতে মামাবাবু বললেন, জান, কোনাস্-গ্লোরিয়া-মারিস্ সারা জগতের সব শেল্ কলেকটরদের স্বপ্ন। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় অ্যাকাডেমি অফ ন্যাচারেল সায়ান্সের মিউজিয়মের স্পেসিমেনটা আমি দেখেছি। সেটা কত দামে কেনা হয়েছিল জান? দু' হাজার ডলার। এ স্পেসিমেনটা তার চেয়ে কোনো অংশে খারাপ নয়, বরং ভাল, অতএব এটার দাম তের-চোদ্দ হাজার টাকা অনায়াসে উঠবে। বলা যায় না, হয়তো চট্টোরাজ স্বয়ংই অফার দিয়ে বসবেন।

—আরে আরে, কাঁদছিস কেন! বড় যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝি! শো শো, আমার কোলে মাথা রাইখ্যা শুইয়া পড়। দেখেন বাবু, মকবুল বড় কাতর হইয়া পড়ছে।

খ্যাপার কণ্ঠস্বরে আমাদের চমক ভাঙ্গে। একেবারে মগ্ন হয়ে ছিলাম। ওদের অস্তিত্ব ভুলেই গিয়েছিলাম। হয়তো আমাদের সব কথাই ওদের কানে গেছে। খ্যাপার শাঁখ-টাখ জমানোর বাতিক আছে। কিন্তু কৌতূহল হলেও অসুস্থ মকবুলকে ছেড়ে সে উঠে আসতে পারেনি। আর মকবুলের তো দাঁড়াবার অবস্থাই নেই। রোদ্দুরে এতটা পথ হেঁটেছে জ্বর গায়ে! হ্যালা কিছুদূরে দণ্ডায়মান। তার বোধহয় এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই। অন্ততঃ মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই। নির্বিকার ভাবে চেয়ে আছে।

মকবুলের মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়েছে, তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। তাড়াতাড়ি তার কাছে গেলাম।

মামাবাবু কোমল স্বরে বলেন, কি মকবুল, খুব কষ্ট হচ্ছে? চল, এবার আমরা ফিরব।

মকবুল মাথা নেড়ে বলে বসল—না বাবু, দেহের কষ্ট নয়। ও আমি পরোয়া করি না। কষ্ট মনের। ভাবছি এত পরিশ্রম করলাম, বিপদে পড়লাম, কিন্তু সব বৃথা। সাত রাজার ধন

মানিক হাতে পেয়েও হারালাম।

—মানে? মামাবাবু অবাক।

—সব শুনেছি, বাবু। ঐ সেই সাগর-গৌরব। কিন্তু ওটা হাতে পেয়েও রাখতে পারলাম না। কি হতভাগ্য আমি!

—ও, তাই বুঝি? মামাবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। তোমার বুঝি ধারণা হয়েছে, আমরা শাঁখটা মেরে দেব! আরে বোকা, তুমি এভাবে জখম না হলে আন্দামানে যে এ-বস্তু পাওয়া যাবে কেউ কল্পনা করত? এ শাঁখ তোমার সম্পত্তি। তুমি আবিষ্কার করেছ।

—সত্যি বলছেন বাবু?

মকবুল মাথা তুলল। তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, কথাটা যেন তার বিশ্বাস হতে চাইছিল না।

—নিশ্চয়! মামাবাবু বললেন।

মামাবাবু তাকে বললেন, এ শাঁখ এখন আমার কাছে থাক। আমি এটা পরিষ্কার করব। তারপর বিক্রি করে কড়কড়ে নোট-গুলো যখন নিজে তোমার হাতে তুলে দেব, তখন টের পাবে সত্যি কি মিথ্যে।

মামাবাবু একট প্লাস্টিকের থলি বের করে সাবধানে শাঁখটা ভিতরে রাখলেন। তিনি হাতের গ্লাভস্ খুলেছেন, হঠাৎ খ্যাপা চেঁচিয়ে উঠল—কত্তা ছ্যাখেন, মকবুল বোধহয় অজ্ঞান হইয়া গেল।

সে মকবুলকে বালির ওপর চিৎ করে শুইয়ে দেয়। মকবুলের চোখ বোজা। শরীর আড়ষ্ট।

মামাবাবু তাড়াতাড়ি তাকে পরীক্ষা করলেন। নাড়ি দেখলেন। তারপর বললেন—হুঁ। সেনস্‌লেস্ হয়ে গেছে। জ্বর রয়েছে, যন্ত্রণা রয়েছে, তার ওপর হঠাৎ বড়লোক হবার শক্ দুর্বল নার্ভ সহ্য করতে পারেনি। তবে ভয়ের কিছু নেই, চোখে-মুখে জল দাও, একটু পরেই ওর জ্ঞান ফিরে আসবে।

—